স্যারের অট্টহাসি

– মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

১৯৯৭ সাল। আমরা তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমাদের মল্লিকস্যার। তিনি সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়টি পড়াতেন। স্যার সম্বন্ধে আগেই একটু বলে নিই।

শিক্ষকদের যা স্বভাব হওয়া উচিত তা–ই ছিল স্যারের মাঝে, একটুও ব্যতিক্রম নয়। পড়া নিতেন কড়ায়গণ্ডায়। সম্ভবত বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন বলেই তার মেজাজ ছিল খুব কড়া। ক্লাসে যে ছাত্র পড়া দিতে না পারে তার ওপরে চলে বেত্রাঘাত। সেদিন স্যারের ক্লাস ছিল টিফিন পিরিয়ডের পরে। এবং পড়াও ছিল প্রচুর। তাই সবাই হালকাভাবে টিফিন সেরে স্যারের পড়া নিয়ে ব্যস্ত। ক্লাসের ঘণ্টা বাজলো, স্যার ক্লাসে এলেন। সবাই ভয়ে অস্থির। কারণ স্যার প্রথমেই পড়া মুখস্থ নেন।

ইতিমধ্যে স্যার চেয়ারে বসলেন। পকেট থেকে তার খাপসহ চশমা টেবিলে রাখলেন। তারপর হাজিরা খাতায় সবার উপস্থিতি লিখলেন। বিপত্তিটা শুরু হলো তখনই। স্যার চশমার খাপ থেকে চশমা খুলে চোখে পরলেন। তবে স্যারের চশমার বাম পাশের কাচটি খুলে চশমার খাপে রয়ে গেছে। স্যার সেই অবস্থায় চোখে পরলেন। কিন্তু স্যার তা বুঝতে পারলেন না। এদিকে আমরা তো হেসেই কূল পাচ্ছি না। যদিও হাসতে শব্দ হয়নি। কিন্তু হাসিতে পেট ফেটে যাচ্ছে।

আমাদের বন্ধু রেজাউল। সে আর হাসি চেপে রাখতে পারলো না।

স্যার তার হাসির শব্দ শুনে অগ্নিশর্মা।

আমার বন্ধুটি বসেছিল ক্লাসের চতুর্থ বেঞ্চে। তাই স্যার তার দিকে যতোই এগিয়ে যাচ্ছে, সে ততোই হাসছে।

তারপর তার কাছে গিয়ে স্যার জিজ্ঞাসা করলেন সে হাসছে কেন।

স্যার তার প্রশ্নের জবাব না পেয়ে ক্লাস ক্যাপটেন আমাদের বন্ধু রফিককে বললেন বেত আনার জন্য।

বেত আনার পর শুরু হলো তার ওপর বেত্রাঘাত। এক পর্যায়ে স্যার অস্থির হয়ে যখনই হাত দিয়ে চশমা ঠিক করতে গেলেন তখনই টের পেলেন তার চশমার ফ্রেমে কাচ নেই। তখনই স্যার চশমাটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চুপ থেকে নিজেই হাসা শুরু করলেন।

আমরা তো সবাই আশ্চর্য! যে স্যারের কখনোই হাসি মুখ দেখিনি সেই স্যার আজ নিজের কারণেই অট্টহাসি হাসলেন।

পরে স্যার রেজাউলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, সেদিন স্যার আর আমাদের পড়া নিলেন না।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে

পরম বন্ধু

– বীথি

চশমা এখন আমার কাছে যন্ত্রণার একটি বস্তু। ক্লাস নাইন থেকে চশমা নিয়েছি। এখন তো প্রায় সব সময় চশমা পরতে হয়। যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, মাঝে মধ্যে শাড়ি পরতে ইচ্ছে করতো তখন নিজ থেকেই কান্না পেতো। কিন্তু কাউকে টের পেতে দিতাম না। ভাবলাম যদি চশমা না পরতাম তাহলে হয়তো একটু বেশি সুন্দর লাগতো।

অনেকে হয়তো মনে করে থাকেন চশমা অনেকটা ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। কিন্তু আমি এবং আমার মতো ভুক্তভোগীরা জানে চশমার কি বিড়ম্বনা! নাকের ওপর ঝুলিয়ে রাখতে হয় ভারী একটা জিনিস। অনেক সময় চোখ থেকে পড়ে যেতে চায়। চশমা পরেছি বলেই বেশি বয়স্ক লাগছে।

শখ করে মাথায় ফুল দেবো পরক্ষণেই ভাবতাম চশমার সঙ্গে ফুল খুব বেমানান লাগবে। এসব ভেবে মাথায় ফুল দিতাম না। সবাই ভাবছে, চশমার সঙ্গে সাজাটা একটু বেশি হয়ে গেল না!

পাত্রপক্ষ যখন দেখতে আসেন তখন চশমা পরেই যেতে হয়। চশমা পরার কারণে তারা ভাবেন মেয়ের বয়স অনেক। অথবা রূপের ঘাটতি আছে। ফলে পাত্রপক্ষ করেন অপছন্দ। মাঝে মধ্যে ভাবি, চশমা পরেই আমার বিয়ে হচ্ছে। আর চশমা পরে বাসর রাতে বরের জন্য অপেক্ষা করছি।

তাই মাঝে মধ্যে চশমাটাকেই অসহ্য মনে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি, এ চশমাই আমার পরম বন্ধু যাকে এক মুহূর্তের জন্য হাতছাড়া করলে আমার চলবে না, যে কি না দূরের জিনিস কাছে এনে দিয়েছে।

সাপ্তাহার, বগুড়া থেকে

প্রেম

– মোহাম্মদ শাহদাত হোসেন জয়

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। আমরা দুই ভাই। আমার বড় ভাইয়ের নাম ছিল এরশাদ। তিনি তখন কলেজে পড়তেন। কলেজে পড়ার সময় মনের অজান্তেই তিনি এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। মেয়েটির নাম ছিল ঝুমা। মেয়েটি আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো। প্রেমের সব চিঠিপত্র আমার মাধ্যমেই দেয়া–নেয়া হতো।

মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় অপ্সরী। বুদ্ধিতেও ছিল সেরা। মেয়েটিও আমার ভাইকে প্রচুর ভালোবাসতো। জীবনের প্রয়োজনে ভালোবাসা যে এতো দরকার তা তাদেরকে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

আমার ভাইয়ের চোখে ছিল সুন্দর ফ্রেমওয়ালা চশমা। চশমার জন্য তাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হতো।

একদিন আমার ভাই ও মেয়েটি বোটানিকাল গার্ডেনে বসে কথা বলছিলেন। হঠাৎ মেয়েটির ভাই শিশির তা দেখে ফেলে। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

শিশির বাসায় গিয়ে তার বাবা মাকে সব খুলে বলে। তারপর থেকে বাবা মা মেয়েটিকে কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

আমার ভাই তাকে না দেখে এক মুহূর্তের জন্যও থাকতে পারতেন না। সে তাকে না দেখলে পাগলের মতো হয়ে যেতো।

আর ওদিকে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য বাবা মা ভালো পাত্র খোজার জন্য উঠে–পড়ে লেগে যায়। এই কারণে হতাশা আমার ভাইকে ঘিরে রেখেছিল। সারাক্ষণ ছাদে বসে উদাস হয়ে যেন কি ভাবতেন। রাতে ঠিকমতো ঘুমাতেন না।

শেষে ঝুমার জন্য পাত্র পাওয়া গেল। কিছু দিনের মধ্যে বিয়ের তারিখ ঠিক হলো। ফলে মেয়েটির বাবা সব কিছু আয়োজন করতে লাগলো। ঝুমা এ বিয়েতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না।

ঝুমার বাবা বলেছে, যদি তার পছন্দ, মতো ছেলেকে বিয়ে না করে তাহলে সে তার বাবার মরা মুখ দেখবে।

চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

বিয়ের দিন ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। ঝুমা অবশেষে বাধ্য হয়ে বিয়েতে রাজি হলো। বিয়ের দিন ছিল শুক্রবার।

আমার ভাই রাজনীতি করতেন। তিনি সব জানতে পেরে তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে সেদিন রাতে বিয়ে ভেঙে দেন।

এতে ঝুমা ভীষণ খুশি হয়।

ভোর না হতেই মেয়ের বাবা পরিবারকে নিয়ে গ্রামের পথে পাড়ি জমান। মেয়েটি যেতে রাজি হচ্ছিল না বলে তার বাবা তাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলেন।

গ্রামে যাওয়ার পর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে ঝুমার আবার বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

মেয়েটির গ্রামে আমার এক দূরসম্পর্কের ফুপু থাকতেন। ফুপু আগে থেকেই ওদের প্রেমের সম্পর্কটা জানতেন। মেয়েটির বাড়িতে বিয়ের কথাবার্তা চলছে শুনে তিনি আমার বড় ভাইকে ফোন করেন।

আমার ভাই সে কথা জানতে পেরে রাতে রওনা দিলেন। মা বাবা নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি কোনো বাধা মানেননি।

ভালোবাসা কোনো বাধা নিষেধ মানে না। রাত এগারোটায় বাসে যাওয়ার সময় মেয়েটির গ্রামের কাছাকাছি এসে বাসটি খাদে পড়ে গেল। ফলে আমার বড় ভাই বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় স্থানীয় লোকজন তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত্যুর খবর শুনে মা বাবা আর্তনাদে মূর্ছা যায়। সন্তান হারানোর কি যে যন্ত্রণা তা শুধু মা বাবারাই বুঝতে পারেন। আমার মা বাবাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা কারো জানা ছিল না। ফলে ফুপুকে আনতে যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম।

বাসে যাওয়ার সময় হঠাৎ বাসটি আমার ভাই যেদিকে দুর্ঘটনার শিকার হন সেখানে থামে। কারণ বাসের সব যাত্রীরা দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শনের জন্য কৌতূহলী ছিল।

হাটতে হাটতে একটি ঝোপ–ঝাড়ের সামনে এসে থমকে দাড়ালাম। দেখলাম আমার ভাইয়ের চশমাটি এক কোণে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তা তুলে নিলাম।

চশমাটির মধ্যে রক্তের দাগ ছিল। আজ প্রায় বিশ বছর পেরিয়ে গেছে। আজও আমার ভাইকে ভুলতে পারিনি।

মা বাবা বেচে আছেন। তারা সেই চশমাটি বুকে ধরে গোপনে কাদেন।

শুনেছি, এক মাস পরেই মেয়েটি টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

ঢাকা থেকে

মনের চোখে

– এমএম ওবায়দুর রহমান

শৈশবে একদিন সিনিয়র এক বন্ধু আমাকে প্রথম চশমা বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই চশমাটা ছিল নারিকেলের পাতায় তৈরি। তাতে কোনো গ্লাস ছিল না। বলতে গেলে নারিকেলের পাতা আর শলার একটা ফ্রেম হয়েছিল মাত্র। অথচ কি আশ্চর্য! ছোটবেলা সেই চশমাটা পরেই চারদিকের পৃথিবীকে রঙিন দেখেছিলাম। আর এখন দামি ফ্রেমের রঙিন গ্লাসের চশমা পরেও চারদিকে যখন, তাকাই মনে হয় সব কিছু বুঝি বর্ণহীন, রঙ জ্বলা।

আসলে চশমা নয়, মনের চোখই পৃথিবীকে রঙিন দেখায়।

পুরনো মডেলের খুব বড় একটা কালো চশমা পরতেন লোকটা, হেটে যেতো খুব ধীরপায়। আমরা তার এই চশমা দেখে হাসতাম খুব।

আমার বন্ধু ইমরান একদিন সেই লোকটার পাশে গিয়ে বললো, আপনার চশমাটা খুব সুন্দর আর ঐতিহ্যবাহী, দয়া করে ওটা কোনো জাদুঘরে দান করে দেবেন যাতে আগামী প্রজন্ম আপনার এই চশমা নিয়ে গবেষণা করতে পারে।

ইমরানের কথা শুনে লোকটা কিছু বললেন না। কেবল চশমাটা খুলে ফেললেন।

আমরা তাকিয়ে দেখলাম লোকটার দু চোখ অন্ধ। তার চোখ নেই। কিন্তু মনে হলো কোথা হতে যেন অঝোর অশ্রু ঝরছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের চশমাটা খুব সুন্দর ছিল। কালো ফ্রেমের পাওয়ারওয়ালা চশমা যা তার অকাল এবং দুঃখজনক মৃত্যুর সময় তার সিড়িতে পাওয়া গিয়েছিল।

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে ব্যাপক সানগ্লাসের প্রচলন করেন। চশমার পাশাপাশি কোট প্যান্ট এবং ক্যাপের প্রচলন করেন জিয়া। আর তার স্ত্রী ১৯৯০ সালে যখন ক্ষমতায় বসলেন, আমরা তার চোখে সুন্দর সব রঙিন চশমা দেখলাম।

এরপর হাসিনা ক্ষমতায় এলেন, আমরা তার চোখে শাদা পাওয়ারওয়ালা চশমা দেখলাম। কিন্তু তার সেই চশমায় এতো বেশি পাওয়ার ছিল যে, জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, হাজি মকবুল, হাজি সেলিম, ডাক্তার ইকবালসহ তার দলীয় ক্যাডারদের চেহারা তিনি দেখতেন সোনার ছেলেদের মতো। ফলে ২০০১ সালের অক্টোবরে হলো তার ভুল দেখার চূড়ান্ত পরিণতি।

এরপর আবার আমরা খালেদা জিয়াকে দেখলাম। তিনি এবার হাসিনার মতো পাওয়ার চশমা পরেন। এবং শেখ হাসিনার মতো তিনিও উল্টা-পাল্টা দেখছেন। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে গিয়েও তিনি দেখছেন দ্রব্যের দাম জনগণের নাগালে। এমনকি সাধারণের ওপর কর চাপিয়ে তিনি সেই টাকায় দেশে মন্ত্রী আর এমপিদের বেতন বাড়িয়েছেন। শেখ হাসিনার মতো তিনি হয়তো এখন দেখছেন তার সুযোগ্য মন্ত্রীরা অনেক বেশি পরিশ্রম করছেন?

অপরদিকে তরুণদের দিকে খালেদা জিয়ার মনে হয় কোনো দৃষ্টি নেই। থাকলে বেকার সমস্যার জন্য তিনি কিছু করতেন। আমরা সাধারণ জনগণ আশা করছি, খালেদা জিয়া বেশি পাওয়ারের এই চশমা বদলে স্বাভাবিক পাওয়ারের চশমা পরবেন যাতে করে তিনি সব কিছু আমাদের চোখে দেখতে পান।

সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদ কালো চশমা পরতেন। তার এই চশমা নিয়ে অনেক গবেষণা শেষে আমার বন্ধু আবু হাসেম বললো, এরশাদ তার কামুক চোখে নারীদের দিকে তাকান। জনগণ যেন তা বুঝতে না পারে সে জন্য তিনি চশমা পরেন।

আরেক বন্ধু দেলোয়ার বললো, আসলে এরশাদের সব লোভ চোখে। তাই তিনি চশমা পরে তার লোভী চোখ দুটোকে ঢেকে রাখেন।

শিবচর, মাদারীপুর থেকে

মধ্য বিরতি

– আলম

ঘটনাটি শুনেছি মহসীনের কাছ থেকে। তখন আমরা মেডিকাল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। মাঝে মধ্যেই ছাদে আড্ডা দিতাম। সেদিন এনাটমির আইটেম ফাইনাল পরীক্ষার ক্লান্তি ঝাড়তে ছাদে গিয়েছি। সঙ্গে রাশু, জুলি, ল্যাটকা, হাবু, আতেল এবং বাপ্পী। গল্প হচ্ছিল চুটিয়ে।

আমাদের মধ্যে বাপ্পী ছিল বেপরোয়া, হাবু হাড়কিপ্টে, ল্যাটকা মিটমিটে শয়তান, জুলি আদর্শবান, রাশু এবং আতেল ছিল বুদ্ধিজীবী টাইপের মানুষ। আর মহসীন ছিল একটু বেশি সাহসী। যে যার মতো

চোখে দেখা কিংবা কানে শোনা নানান রসালো ঘটনা বলছি। ছাদ থেকে পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে দেখা নব দম্পতির কাহিনী, বখে যাওয়া বন্ধুদের কীর্তি ইত্যাদি।

মহসীন গল্প শুরু করলো। তার ভাষায় সেটা গল্প নয়, তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা। আজ এতোদিন পর মহসীনের সেই বন্ধুটির নাম আমার মনে নেই। ধরা যাক, তার নাম টিটু।

ছাত্র হিসেবে টিটু ভালো ছিল না। এইচএসসি–তে আশানুরূপ ফল না করায় তার বাবা মা তাকে বিদেশে চাকরির জন্য পাঠায়। সে আগে কখনো বিদেশ যায়নি। সেদিনই প্রথম প্লেনে ভ্রমণ করছিল। পাশে ছিল সুন্দরী সহযাত্রী। মহিলাটির বয়স পয়ত্রিশের মতো মনে হয়েছে তার কাছে। তাদের ভেতর কথাবার্তা হয়।

তাদের কথাগুলো কি ছিল? মুচকি হেসে লিটন প্রশ্ন করে।

ভালো জানি না। যা জানতাম তাও আবার তেমন মনে নেই। মহসীন জবাব দেয়।

সম্ভাব্য কথা রাশু বানিয়ে বলতে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কদের কথা।

আতেল তাতে যোগ দেয়।

আতেলকে থামিয়ে দেয়া হয়। মহসীন বলা শুরু করে। টিটু ছিল প্রায় ছয় ফিট লম্বা, সুঠাম শরীরের অধিকারী, মাথা ভর্তি চুল এবং শ্যামলা। কারণে–অকারণে, আলো–আধারে সব সময় সানগ্লাস পরতো। এতে তাকে আরো বেশি হ্যান্ডসাম লাগতো। কিন্তু তার হাবভাবে প্রথম বিমান ভ্রমণের চিহ্ন স্পষ্ট ছিল।

এই প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছেন? সহযাত্রীটি টিটুর কাছে জানতে চায়।

হ্যা।

আমাদেরকে তো মধ্য বিরতিতে থামতে হবে সহযাত্রী বললো।

জানি। টিটুর সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

এরপর পথে অনেক কথা হয়।

মধ্য বিরতিতে দুজন নামে। টিটুকে একটি আবাসিক হোটেলে নিয়ে যায় সহযাত্রী। দুজনের জন্য দুটি রুম বুকিং দেয়। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে কেনাকাটায় বের হয়। অনেকটা জোর করে টিটুকে প্যান্ট শার্ট কিনে দেয়। একটা ওষুধের দোকান থেকে একটা অয়েন্টমেন্ট জাতীয় ওষুধ কেনে। হোটেলে ফিরে ইজি হয়ে দুজনে আড্ডা শুরু করে দেয়। রাত গভীর হলে টিটু রুমে চলে যাওয়ার অনুমতি চায়।

অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। মহিলা টিটুকে থামায়।

আপনি থেকে তুমিতে নামে মহিলা। টিটু কিছু মনে করে না। বরং ভালোই লাগছিল তার। রাত যতো বাড়ে, মহিলার উদ্দেশ্য ততোটা স্পষ্ট হতে থাকে টিটুর কাছে। এক সময় আনড়ি টিটুকে অভিজ্ঞ মহিলা তার আয়ত্তে নিয়ে যায়। শুরু হয় মহিলার ইচ্ছে পূরণ। জাইলোকেন জাতীয় লোকাল অবশকারী অয়েন্টমেন্ট টিটুর মূল্যবান অঙ্গে মাখতে ভুল করে না মহিলা। চরম মুহূর্তে টিটুর সানগ্লাস খুলতে চায় মহিলা।

টিটু রাজি হয় না।

এক সময় মহিলা তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।

পরদিন যাত্রা শুরুর আগে মহিলার অনুরোধে টিটু তার সানগ্লাস খোলে।

মহিলা হাসে। টিটুকে সে দামি একটি সানগ্লাস কিনে দেয়।

বছর দুয়েক পরে ছুটিতে দেশে আসে টিটু। তার কাছে মহিলাটির একটি কার্ড ছিল। টিটু মহিলার গুলশানের ঠিকানায় দেখা করতে যায়। ঠিকানা ঠিক ছিল। কিন্তু মহিলা টিটুর সঙ্গে দেখা করে না।

টিটু আবার বিদেশে চলে যায়। যাওয়ার আগে মহসীনকে কার্ডটি দিয়ে বলে, চেষ্টা করে দেখ, তুই পেলেও পেয়ে যেতে পারিস।

আমরাও চেষ্টা করবো। সবাই প্রায় এক সঙ্গে বলি উঠি।
সুন্দর সানগ্লাস পাবো। বাপ্পী বলে।
অন্য সব হয়তো পাবি। কিন্তু সানগ্লাস নয়। মহসীন জবাব দেয়।
কেন?
কারণ তোরা স্কুইন্ট নস।

শেরে বাংলানগর, ঢাকা থেকে

রহস্য

– মিরাজ

সামিয়া এবং আমার বয়সের পার্থক্য মাত্র একদিনের পার্থক্য অর্থাৎ সে ২৭ এপৃল আর আমি ২৯ এপৃল। সে আমার ছোট চাচার বড় মেয়ে। ছোটকাল থেকে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব।
আমরা ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে অর্থাৎ কক্সাবাজারের ডুলাহাজারায় থাকতাম। সামিয়ারা চট্টগ্রামে থাকতো। গ্রামের বাড়িতে যখন আসতো তখন আমরা সবই খুব খুশি হতাম।
যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার চাচার চাকরির সুবাদে তারা সউদি আরব সপরিবারে চলে যায়। তখন তাদের জন্য খুব খারাপ লাগছিল।
দেখতে দেখতে দুই বছর পার হয়ে গেল। একদিন খবর পেলাম সামিয়ারা সবাই দেশে চলে আসছে। শুনে খুব খুশি হলাম। ডুলাহাজারা থেকে আব্বা ও আমি চট্টগ্রামের জামাল খানে আমার ছোট ফুপুর বাসায় এলাম।
কারণ তারা সেখানে উঠেছে।
বাসায় গিয়ে সামিয়া কোথায় খুজতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে সালোয়ার কামিজ পরা ওড়না আছে এবং চোখে বড় কাচের মোটা চশমা। প্রথমে চিনতে পারিনি, পরে দেখি সামিরা। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার চোখের এ অবস্থা কখন থেকে।
সে বললো, সউদি যাওয়ার পর থেকেই চশমার কাচ দিন দিন মোটা হয়েছে।
এরপর লিটনভাই, আমার মেজ চাচার ছেলে। সামিরাকে কানি বলে খেপাতো।
তার চশমা খুলে বলতাম, দেয়াল ঘড়ি দেখে বলো তো এখন কয়টা বাজে।
সে ঠিকভাবে বলতে পারতো না।
তারপর হাতের মধ্যে কয়টা আঙুল আছে জিজ্ঞাসা করলে সে ঠিকভাবে বললেও আমরা বলতাম হয়নি।
কিছু দিন থেকে চলে এলাম কক্সবাজারে।
এরপর চট্টগ্রামে চলে এলাম ছোট ফুপুর বাসায় থেকে পড়ালেখা করতে।
যখন চট্টগ্রামে আসি তখন আমার ছোট চাচা ঢাকায় চলে এলেন সপরিবারে।
আমার এসএসসি পরীক্ষার পর ঢাকায় গেলাম বেড়াতে। সামিয়াদের বাসায় উঠলাম। সামিয়া এসে বললো কি খবর!
বললাম, ভালো। তারপর খেয়াল করলাম তার চোখে সেই মহা বস্তুটি অর্থাৎ চশমা নেই।
কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, তোমার চশমা কই!
সে হেসে বললো, জানো না আমার চোখ ভালো হয়ে গেছে?
বললাম, কিভাবে।
সে বললো, পানি পড়া খেয়ে।

তারপর অনেক জিজ্ঞাসা করার পরও কোনো মনের মতো উত্তর পেলাম না।
সে বললো, এখন দেয়াল ঘড়িতে কয়টা বাজে বলবো? বিকাল পাচটা পনেরো মিনিট পচিশ সেকেন্ড। আমি তো অবাক। যে মেয়ে চশমা ছাড়া তিন হাত পর্যন্ত দেখতো না! তার এই উন্নতি কিভাবে হলো!
রাতে যখন ঘুমাতে যাচ্ছে তখন দেখি সে চোখ থেকে কি যেন খুলছে। কাছে গিয়ে দেখি সে চোখ থেকে বিজ্ঞানের অবদান কন্টাক্ট লেন্স খুলছে। তারপর সে চশমা পরলো।
বললাম, এই তোমার পানি পড়ার রহস্য!

চট্টগ্রাম থেকে

জটিলতা

আমরা হচ্ছি ইউনিভার্সিটির মোটামুটি ব্যতক্রমী একটি ব্যাচ। ফার্স্ট ইয়ারে বেশ কিছু দিন আমাদের ক্লাস হতো বিকেল তিনটায়। ক্লাস শেষে সবাই হুড়োহুড়ি করে বাসার দিকে ছুট।
জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল। দিনের পরিধিও ছিল কম। তারপরও ক্লাসের স্বল্প সময়টুকুতে বেশ কয়েকজন বন্ধু জুটে গেল। আপাতত কোনো মেয়েকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া গেল না।
ক্লাস শুরু হওয়ার প্রায় মাস খানেক পরের ঘটনা। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে বাজে আচরণ ও চেহারার অধিকারী টিচারের ক্লাস করছি। আমার সব সময়ের অভ্যাস ক্লাসের পেছন দিকে বসা। শেষ বেঞ্চিতে বসে আমরা তিন বন্ধু পরস্পরকে চিরকুট লিখছি ক্লাসের বিভিন্ন মেয়ের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে। মেয়েদের দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো পুরনো মডেলের চশমা পরা একটা মেয়ে। চেহারার মাঝে তার কিশোরী কিশোরী ভাব প্রবল। ঘাড় পর্যন্ত খাটো চুল, লাল রঙের ড্রেস পরা, ফুটফুটে গায়ের রঙ। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম মেয়েটির দিকে। মেয়েটি সেদিনও জানেনি, এখন পর্যন্ত জানে না ওই একমাত্র মেয়ে যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।
আমার মুগ্ধতা কাটলো আমার বন্ধুদের কলমের খোচা খেয়ে। আমাকে নিয়ে ওরা দুজন হাসাহাসি করতে থাকে।
দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা তখন স্যারের নজরে পড়ে যাই। স্যার আমাদের তিনজনকেই রীতিমতো ঘাড় ধরে ক্লাস থেকে বের করে দেন। একটি সুন্দর ঘটনার বিষণ্ন পরিণতি।
তারপর কি করে যেন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং কিছু দিনের ভেতর আমরা বন্ধু হয়ে যাই। ধরে নিই মেয়েটির নাম শম্পা। আমি হচ্ছি একটু উল্টো ধরনের মানুষ। আমার যা ভালো লাগে তা এমনভাবে প্রকাশ করি যাতে অপরের কাছে মনে হয় ব্যাপারটি আমার কাছে খুবই অপছন্দের।
শম্পা যখন চশমাটি পরে থাকতো তখন তার চেহারায় নিষ্পাপ সৌন্দর্য খেলা করে যেতো। এ সৌন্দর্য কাছ থেকে দেখা কতোটাই যে অসহ্য ভালো লাগাময় ছিল তা একমাত্র আমিই বুঝতে পারতাম। সে যখন চোখে চশমা পরে থাকতো তখন আমার বন্ধুটির দিকে আমি ভুলেও তাকাতাম না। আমি যদি এই মেয়েটির প্রেমে পড়তাম তাহলে বলতাম, চশমাওয়ালী শম্পার ছবি আমার হৃদয়পটে আকা। ওই চশমা বিহীন শম্পার কোনো অস্তিত্ব আমার পৃথিবীতে নেই।
একটু আগেই বলেছিলাম আমি উল্টো মানব! শম্পাকে সব সময় বলতাম তোমার চশমাটি ষাট দশকের মডেল। আরো নানান বাজে কথা বলে তাকে খেপাতাম। আমাদের দুই তিন বন্ধুর কথায় অসহ্য হয়ে শম্পা চশমার ফ্রেম পরিবর্তন করে। যদিও এর মাঝে কেটে গেছে এক বছর।

রিনির নতুন চশমার মডেলটি আমিই পছন্দ করে দিই। দেখতে যথেষ্ট আধুনিক ও সুন্দর রিমলেস চশমা। কিন্তু রিনি পরা মাত্রই মনে হলো কোথায় যেন কি হারিয়ে গেল! আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন একটা অস্বস্তি আমার ভেতর কাজ করছিল।

আমি সংস্কার বিশ্বাসী নই। পদার্থ বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে মনে করি, প্রথম Cause তারপর Effect.

নতুন চশমা পরার পর থেকে শম্পার চেহারা থেকে দুটো জিনিস হারিয়ে গেল। *এক.* আন্তরিকতা, *দুই.* সরলতা ও নিষ্পাপতা।

এভাবে যতো দিন গড়িয়েছে, আমার মনে হয়েছে, তার থেকে সব হারিয়ে গেছে। লাবণ্যতা, স্নিগ্ধতা সব তার চেহারা থেকে উধাও হয়ে গেল। যদিও আমার বন্ধুরা বলেছে, শম্পা নাকি আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে সে আন্তরিকতাহীন সৌন্দর্যের কংকালে পরিণত হয়েছে। এখানে Cause নেই। তবে Effect আছে।

শম্পার সঙ্গে পরিচয়ের আড়াই বছর পর সে আজও আমার বন্ধু। এক সময় শম্পার দিকে তাকাতাম না অসহ্য ভালো লাগায়। আজো তাকাই না। তবে তা ভালো লাগা না থাকায়। শম্পা, আমি তোমার চশমাটিকে *অপয়া* বলবো না। কারণ কুসংস্কার বিশ্বাস করি না।

একবার মনে হচ্ছে, আমার মনস্তুষ্টিতে জটিলতা আছে। কিন্তু আমি জানি তা সত্য নয়। তারপরও আমাদের দুজনের বন্ধুত্বের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল। এর কারণ কি? তুমি? আমি? চশমা? না অন্য কিছু?

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কাচহীন

– মুহাম্মদ ওমর ফারুক

আমার বাবার চশমা। বাবা পুলিশে চাকরি করতেন। গত মাসে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। আদর্শবান বললে কতোটুকু বিশ্বাস করবেন পাঠক সমাজ তা জানি না। তবে এটুকু বলে রাখলাম তিনি কর্মজীবনে সৎ ছিলেন। তাই এখন গর্ব ভরে তাকে নিয়ে কলম ধরেছি।

বাবার একটা চশমা আছে। পুরনো দিনের চশমা। কালো, মোটা, শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি ফ্রেমখানা। তবে কোনো কাচ নেই চশমাটার। আগে যখন ছোট ছিলাম তখন বুঝতাম না এটা দিয়ে কি করেন বাবা। আস্তে আস্তে যখন বুঝতে শিখলাম তখন একদিন ছবির অ্যালবাম উল্টাতে গিয়ে বাবার প্রতিটা ছবিতে দেখলাম সেই চশমার ব্যবহার। ছবিতে বোঝাই যায় না চশমাটার কোনো কাচ নেই। মার কাছ থেকে শুনেছি এটা তার প্রিয় চশমা।

বাবা অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। এবং এই মাঝামাঝি বয়সেও বেশ আছেন। এখনো যখনি বাবার কোনো সিঙ্গল ছবি ওঠানো হয় তখন তিনি ছবি তোলার আগে কাচ বিহীন চশমাটা পরে নেন।

কথায় কথায় একদিন বাবাকে চশমাটার কাচ লাগানোর কথা বলেছিলাম।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কাচ ছাড়া ছবিতে ওই চশমার ফ্রেমের ভেতর চোখ দুটো যেমন সুন্দর করে ভেসে ওঠে, কাচ থাকলে তার অনেকটাই ম্লান হয়ে যাবে।

এই কাচহীন চশমায় ছবি তোলার বুদ্ধি বাবার মাথায় কিভাবে এলো এ নিয়ে মার কাছ থেকে জেনেছিলাম। তখন ১৯৬৮ সাল। বাবা সদ্য পুলিশের চাকরিতে নিয়োগ পেয়েছেন। রাজশাহীর সারদায় ট্রেনিং শেষ করার পর বাবার প্রথম পোস্টিং হলো পাবনা জেলায়। তখনকার সময়ে এ জাতীয় চশমাগুলোর প্রচলন

ছিল। সুদর্শন পুরুষরা তখন এসব চশমা ব্যবহার করতেন। অবশ্য সেগুলোর কাচ ছিল। বাবাও এ রকম চশমার প্রতি আগ্রহ অনুভব করলেন। তখন বাবার বেতন ছিল পচাত্তর টাকা। যদিও বিয়ে করেননি তখন তবুও ভাই-বোন, মা-বাবার জন্য বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ টাকা বাড়িতে পাঠাতেন। মোটামুটি দাম ছিল বিধায় কম লোকই এসব চশমা ব্যবহার করতো। সেই সময় ছয় সাত আনায় কেজিখানেক চাল পাওয়া যেতো। সেখানে চশমার দাম ছিল প্রায় পাচ টাকার মতো। কিন্তু শখের মাত্রা এতোই বেড়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত চশমা কিনেই ফেললেন।

চশমা কেনার পর ছবি তোলার ঝোকটা বেড়ে গেল। আগেই বলেছি, আমার বাবা সুপুরুষ ছিলেন। তিনিও সেটা অনুভব করতেন।

একবার ছবি তুলতে গেলেন স্টুডিওতে। চশমা পকেট থেকে বের করে চোখে দেয়ার মুহূর্তে হাত থেকে পড়ে গিয়ে চশমার একটা কাচ সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। আরেকটি কাচের মাঝে বেশ একটা চির ধরে।

বাবার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। হাতে নিয়ে চশমাটা যখন দেখলেন ব্যবহারের অযোগ্য তখন আবার হাত থেকে ফেলে চশমার বাকি কাচটায় সমাপ্তি ঘটালেন।

স্টুডিও-এর লোকটি সান্ত্বনা স্বরূপ বাবাকে বললেন, ভাইসাব, দুঃখ করবেন না। চশমার কাচ আবার লাগালে ঠিক হয়ে যাবে। কাচ ছাড়াই একটা ছবি তুলে দিই, দেখবেন খারাপ লাগবে না।

বাবা বুঝতে পারলেন না লোকটি উপহাস করছেন কি না? তারপরও কাচ বিহীন চশমাটা পরে স্টুডিও-র আয়নায় নিজের চেহারাকে বেশ সপ্রতিভ দেখেও দ্বিধা নিয়ে ছবি তুললেন।

কয়েকদিন পর যখন ছবি আনতে গেলেন, স্টুডিওর লোকটি বেশ খুশি খুশি গলায় বললেন, ভাই, আপনার ছবিটা দারুণ হয়েছে।

বাবাও ছবি দেখে চমকে গেলেন। আগে যখন চশমার কাচ ছিল তখন এতো সুন্দরভাবে চোখগুলো ভাসেনি। ফলে ছবিটির পূর্ব অবস্থান বর্তমানের চেয়ে অনেকটা অনুজ্জ্বল। এরপর বাবা ওই চশমায় আর কাজ লাগাননি। ছবি তোলার সঙ্গী হিসেবে এখনো সেই কাচহীন চশমাটা তিনি ব্যবহার করেন।

আম্বরখানা, সিলেট থেকে

পরীক্ষা

– অনামিকা

আমি চাকরিজীবী। আমার বাড়ি থেকে অফিসে যেতে চল্লিশ পয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। এ পথের মাঝেই আমাদের বড় অফিস। এখানকার অফিসাররাই আমাদের পরিচালনা করেন। প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট তারিখে আমাদের অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বড় অফিস থেকে নিয়ে আসি। কিন্তু জিনিসপত্রের স্বল্পতার কারণে এ মাসে আনা হয়নি। অফিসারের কথামতো কয়েকদিন পরে গেলাম।

তিনি বললেন, আজ আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি কাল এসো।

পরের দিন আবার গেলাম। সেখানে আরেক কলিগ-এর সঙ্গে দেখা হলো। কুলশাদি বিনিময়ের পর ব্যস্ততার সঙ্গে বললাম, আমাকে আগে ছাড়ুন। আজ অনেক কাজ রয়েছে।

বললেন, একটু দেরি করো।

তারপর তিনি এঘর-ওঘর করে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করলেন।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেমন যেন ভয় করছে। আবার নিজের ওপর রাগ হচ্ছে যে, কি সব আবোল-তাবোল ভাবছি।

আজ বাড়ি থেকে আসার সময়ও ভয় করছিল। কিন্তু ভদ্রলোককে আমি ভীষণভাবে শ্রদ্ধা করি। তবে তাকে নিয়ে অনেকে অনেক খারাপ কথাও বলেছে। তবুও তাকে বিশ্বাস করেছি। হয়তো বা তার প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই খারাপ ভাবতে পারি না।

আমার কলিগ উঠলো। চলে যাবে।

তাই বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এক সঙ্গে যাবো।

ভদ্রলোক বললেন, তুমি একটু দেরি করো। জিনিসপত্র আজই এনেছি। এখনো খোলা হয়নি।

তাহলে অন্যদিন এসে নিয়ে যাবো।

না, না আজই নিয়ে যাও। কখন আসবে, হয়তো আমাকে পাবে না।

কলিগও বললো, হ্যা, তুই দেরি করে নিয়ে যা।

অগত্যা বসে আছি।

ভদ্রলোক বললেন, যাও ও ঘরে গিয়ে জিনিসগুলো বস্তা থেকে বের করো।

সে ঘরে ঢুকে জিনিসগুলো গোছগাছ করছি।

এমন সময় ভদ্রলোক হাজির। বললেন, থামো, তোমার চশমা খোল।

কেন?

আহা, খোল না!

কিছু বুঝতে পারছি না। আমি চশমায় হাত দিতেই আমার হাত দুটি ভদ্রলোক ধরে ফেললেন।

কি ব্যাপার? এমন করছেন কেন?

হাত দুটি আরো শক্ত করে ধরে তিনি বললেন, তোমাকে একটি কথা বলতে চাই।

বুঝলাম ব্যাপারটা অন্য রকম। কৌশলে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে।

কি বলতে চান, বলুন।

আড়ষ্ট গলায় বললেন, আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি। ভীষণ ভালোবাসি অনেক দিন ধরে।

কিন্তু বলতে পারি না। আবেগের সঙ্গে তিনি হাত দুটি বেশ শক্ত করে ধরে রেখেছেন।

তাতে কি হয়েছে, সে কথা এভাবে কেন?

তার শ্বাস–প্রশ্বাসে মনে হচ্ছে তিনি স্বাভাবিক নন। আমাকে তার অনেক কাছে টানতে চাইছেন। বাধা দিয়ে বললাম, ছিঃ ছিঃ, ভাবতে পারছি না। আপনি এমন! আপনাকে শ্রদ্ধা করি, এমন ব্যবহার আশা করিনি। ছাড়ুন আমার হাত।

না, ছাড়বো না। তুমি বিশ্বাস করো। আরো জোরে ধরলেন।

চুপ করুন, এতো শ্রদ্ধা করি সেটা ভালো লাগে না? প্লিজ, এমন কিছু করবেন না, যে কারণে আপনার শ্রদ্ধার বদলে ঘৃণা জন্ম নেবে। মানুষের উচিত নয় কারো প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট করানো।

আবারও কিছু তিনি বলতে চান।

দেখুন এখনো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে চাই। শ্রদ্ধা করে যাবো যদি এখানেই আপনি থেমে যান।

কথাগুলো শেষ হতেই তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন।

সত্যি তো? আমাকে ভুল বুঝবে না তো?

না, বুঝবো না।

আসলে তোমাকে নিয়ে এ অফিসে সবাই খারাপ কথা বলে। আমার ভীষণ কষ্ট হয়। তাই ভাবলাম, তোমাকে পরীক্ষা করবো তুমি কেমন।

তাই? চলুন সামনের ঘরে। ওখানে বসে কথা বলি।

তারপর সামনের ঘরে গিয়ে দেখি জানালা দরজা বন্ধ করে রাখা। তিনি খুলে দিলেন।

সেখানে বসলাম।

আমি আসছি, বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে বললেন, পরীক্ষায় তুমি পাস করেছো।

আমি তখনো বসে বসে কাদছি। তিনি আমাকে বোঝাতে চাচ্ছেন, নিজের ইচ্ছায় কিছু করেননি। লোকের কথায় আমাকে পরীক্ষা করেছেন মাত্র।

মনে মনে বললাম, হায়রে পুরুষ মানুষ! লোকের কথায় একটি মেয়ের চরিত্র পরীক্ষা করতে এসেছো যদিও এটা চারিত্রিক পরীক্ষা কেন্দ্র নয়। একজনের পরীক্ষা নিতে গিয়ে নিজের পরীক্ষা যে দিয়ে দিলে সেটা বোঝারও অবসর তোমাদের (পুরুষদের) নেই।

যে মেয়েটির পরীক্ষা তুমি নিলে সে তো ঠিকই পাস করলো। আর তোমাকে নিয়ে সেও অনেক কথা শুনেছে। কিন্তু তোমার পরীক্ষা সে নিতে চায়নি। যেহেতু সে চারিত্রিক স্কুলে শিক্ষকতা করে না। তবুও তুমি নিজেই নিজের পরীক্ষা দিলে। ফলাফলটাও নিজেই বের করে নিও প্লিজ। বলো আমাকে, তুমি পাস, না ফেল, নাকি এক্সপেল্ড।

বললেন, তোমাকে নিয়ে এখানকার কয়েকজন অনেক কথা বলেছে।

আমি তখনো কাদছি।

কথা বলছো না যে, আমি তোমাকে তো কিছু বলিনি, তুমি কি রাগ করেছো?

বললাম, দেখেন, এমন কোনো মানুষ নেই যে কম বেশী সমালোচনার শিকার হয়নি। এই আপনাকে নিয়েও অনেকে অনেক কথা বলেছে। আমি তো আপনাকে কখনো বলিনি?

তাই আমাকে নিয়ে বলেছে? আমাকে বলোনি কেন?

কেন বলবো? আমি তো আপনার খারাপ কিছু খোজার চেষ্টা করিনি। তাছাড়া আমার চোখ আছে। আমি পরের কথায় কান দিই না। তবুও আসি এখানে নির্ভয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আপনাকে বাপের মতো সম্মান করেছি। আপনার বড় বড় ছেলেমেয়ে, নাতিপুতি রয়েছে। আপনার মানসিকতা এমন হবে ভাবতে পারিনি। তাই ওসব বিশ্বাস করিনি।

তারপর সেখান থেকে চলে এসেছি। আর সেই অফিসারের সামনে যাইনি।

এখনো আমি প্রতিদিন চশমা ব্যবহার করি। প্রতিদিনই একবার মনে পড়ে সেই কষ্টের স্মৃতিটা। শখের চশমা আমার বেদনা হয়ে দাড়িয়েছে। তাকে বলেছিলাম, আমি শ্রদ্ধা করে যাবো আজীবন। চেষ্টা করি তাকে নির্দোষ ভাবতে। কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারিনি। কষ্টে বুকটা ফেটে যায়। ধিক্কার আসে পুরুষের প্রতি। ভদ্রলোক যে অন্যের কথায় প্ররোচিত হয়েছিল এটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। পয়তাল্লিশ–এর উপর বয়স, নামাজ–রোজা করেন। শিক্ষিত এবং সম্মান নিয়ে চলেন মনে হয়েছিল। তিনি কি করে পরের কথায় এ কাজ করবেন বুঝতে পারি না!

যে সুন্দর মন নিয়ে আমার সকাল শুরু হয়, চশমাতে হাত পড়লেই সে সকাল মুহূর্তেই গড়িয়ে অমাবস্যার কালো রাত নেমে আসে। আমি ভুলতে চাই এ দুঃস্বপ্ন। এ স্মৃতি বয়ে বেড়াতে আমার একার ভীষণ কষ্ট হয়।

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ থেকে

উদ্ধার

– এস.আই পাঠান

শহরটা আজ শোকে–দুঃখে নিথর, নিস্তব্ধ, প্রাণহীন। অন্যান্য দিনের তুলনায় কর্মচাঞ্চল্য যেন আজ লোপ পেয়েছে। প্রাকৃতিও আজ সবার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বিরামহীনভাবে কেদে চলেছে। *এম.ভি নাসরিন* মেঘনা–ডাকাতিয়ার মিলনস্থলে, বড় স্টেশনের মাজারের সন্নিকটে প্রবল স্রোতের ঘূর্ণির মুখে ডুবে যাওয়ায় সবাই যার যার কাজকর্ম ফেলে পাগলের মতো চলেছেন বড় স্টেশনের দিকে। কেউ বা হাসপাতালে আত্মীয়–স্বজনদের খোজার আশায়।

সবার সঙ্গে শোক ভাগাভাগি করার জন্য আমিও গেলাম বড় স্টেশন এলাকায় যেখানে গত দুই দিন আগে এম.বি নাসরিন হাজার খানেক মানুষ নিয়ে ডুবেছিল।

নদীর দুই পাড়ে হাজার হাজার মানুষের নীরব কান্না দেখে আমিও নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। অধীর আগ্রহ নিয়ে মানুষজন অপেক্ষা করছেন কখন লঞ্চটি উদ্ধার হবে, আপনজন পাবে তাদের প্রিয়জনদের লাশ। উদ্ধারকারী জাহাজ *হামজা* এবং *রুস্তম* এসে পৌছালেও দুর্ঘটনাস্থলে প্রচণ্ড ঢেউ–এর সঙ্গে ঘূর্ণির কারণে উদ্ধার কাজে অংশ নিতে পারছে না। ফলে দুর্ঘটনা স্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে জাহাজদ্বয় নোঙ্গর করে রাখা হয়েছে। জীবনের ঝুকি নিয়ে ট্রলার ভাড়া করে বিপজ্জনক ঘূর্ণির উপর দিয়ে উৎসুক মানুষ রুস্তম ও হামজা দেখার জন্য যাচ্ছে।

আমিও উৎসাহী হয়ে আরো দশ বারোজন মিলে একটি ট্রলার ভাড়া করে রুস্তম ও হামজা দেখার জন্য যাত্রা করলাম। উল্লেখ্য, আমাদের সঙ্গে তিনজন মহিলা ও দুজন শিশুও ছিল।

ট্রলারচালক ডাকাতিয়া নদীর মাঝখানে এসে বিপজ্জনক এরিয়া অর্থাৎ ঘূর্ণি এলাকা অতিক্রম করার জন্য ট্রলারের গতি কমিয়ে দিলেন। চারদিকের প্রকাণ্ড ঘূর্ণির স্রোত দেখে আমিসহ অনেকেই ভয় পেয়ে গেলাম। ট্রলারচালক আল্লাহকে ডাকার জন্য সবাইকে বললেন। শিশু দুইটি চিৎকার শুরু করেছে। চারদিকে স্রোতের ঘূর্ণি ও বিশাল ঢেউ–এর হুংকারে ট্রলারচালক ট্রলার নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

কচুরিপানার মতো ট্রলার দুলতে শুরু করেছে। যে কোনো সময় ডুবে যেতে পারে। সবাই কান্নাকাটি শুরু করেছি এবং যে যা সূরা কালাম পারে তাই পড়ছে। আমিও আসন্ন বিপদের কথা ভেবে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। ভয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি, ঘূর্ণি স্রোতের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছি না।

দুদিন আগে ঠিক এ জায়গায় রাক্ষুসী ঘূর্ণি স্রোত এম.ভি নাসরিনকে গিলে খেয়েছে। আর এটা তো সামান্য ট্রলার মাত্র। হঠাৎ একটি বিশাল ঢেউ এসে ট্রলারটি কাত করে ফেললো। এর মধ্যে ট্রলারচালক ট্রলারের নিয়ন্ত্রণ হারালেন।

এর মাঝে তিনজন নদীতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমি সর্বশক্তি দিয়ে ট্রলারের একটি পাটাতন ধরে রেখেছি। মহিলারা শিশু দুটিকে ঝাপটে ধরে কান্নাকাটি করছে। তখন একমাত্র জীবনটা বাচানো ফরজ হয়ে দাড়িয়েছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, নৌবাহিনীর দুটি স্পিডবোট আমাদের লক্ষ্য করে তীরের বেগে এগিয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ডে আমাদের ট্রলারের কাছে এসে সবাইকে উদ্ধার করে তীরে নিয়ে গেল।

আমরা সবাই বেচে থাকার আনন্দে, জীবনটাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে আরো একবার কাদলাম। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে দেখলাম আমার পকেটে থাকা প্রিয় সানগ্লাসটিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র একটিও নেই। সানগ্লাস নেই তাতে মোটেও দুঃখিত নই জীবনটাকে ফিরে পাওয়ায়।

নাসরিনকে উদ্ধারের জন্য রুস্তম ও হামজা এসেছে, এসেছে অত্যাধুনিক *শৈবাল*-ও। কিন্তু আমার প্রিয় সানগ্লাস উদ্ধারের জন্য কোনো আধুনিক যন্ত্রাংশের প্রয়োজন নেই। কারণ আমার জীবন যন্ত্রকেই যে উদ্ধার করতে পেরেছি সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

চাদপুর থেকে

তেল মর্দন

– সুলতান মাহমুদ

আসমাভাবী যতো না সুন্দরী তারচেয়ে ঢের বেশি সুন্দরী তিনি নিজকে মনে করেন। কেউ যদি তার রূপের একটু-আধটু প্রশংসা করে তবে তিনি খুশিতে গদ গদ হয়ে ফেটে পড়তে চান। আমরা কয়জন কলেজ পড়ুয়া দেবর শ্রেণী তাকে নিয়ে রূপ বিষয়ক কথা বলে বেশ মজা করতাম।

ভাবীর বয়স সবেমাত্র ত্রিশ পার হয়েছে। দুই সন্তানের জননী। তিনি রূপালী ফ্রেমের মাঝারি আকারের একটা চশমা ব্যবহার করতেন। যদিও তার চোখের কোনো অসুবিধা ছিল না। আমাদের ধারণা, ভাবীর এটা আলগা ফ্যাশন।

ঠাট্টাচ্ছলে বলতাম, এই রূপসী ভাবীজান, এ চশমাটা আপনাকে মানায় না, সোনালি ফ্রেমের কালো গ্লাসের একটা চশমা চোখে লাগান। আপনাকে ঠিক নায়িকা শাবানার মতো লাগবে।

ভাবীর চোখে মুখে তার আনন্দের ঝিলিক ওঠে। হাবভাবে মনে হলো, তিনি সত্যি সত্যিই নায়িকা শাবানা হয়ে গেছেন। আমাকে সেদিন বেশ করে চা বিস্কিট খাইয়েছিলেন ভাবী।

দুই দিন পর ভাবীর চোখে দেখলাম ঠিক আমার পছন্দের চশমা। শুধু তাই নয়, শাবানার পোশাক, কাপড়-চোপড়, সব কিছুই নকল করে চলাফেরা করছেন।

এবার আমার বন্ধু বাবুকে সব খুলে বললাম। এখন তুই একটু মজা কর।

ভাবীকে বাবু বললো, আরে ভাবী, কি সব চোখে দেন, বিচ্ছিরি দেখায় আপনাকে। কালো মোটা ফ্রেমের শাদা চশমা চোখে লাগান, আপনাকে সুচিত্রা সেনের মতো লাগবে। কি দারুণ রূপ আপনার।

হাসিতে ফেটে পড়েন ভাবী। তোরা সব কয়টা পাজি আমাকে পাগল করে ছাড়বি। কোথায় সুচিত্রা আর কোথায় আমি। যাহ! মিথ্যা বলছিস।

না, না, মিথ্যা বলিনি। বিধাতা কি রূপ আপনাকে দিয়েছে, বুঝতে পারছেন না। চিনেছি আমরা। তাই তো ধন্য আমরা আপনার মতো ভাবী পেয়ে।

আরো কিছু তেল মারা কথা বলে বাবু সেদিন ভাবীর কাছ থেকে ত্রিশ টাকা খসিয়েছিল সিনেমা দেখবে বলে।

ভাবীও খুশি মনে দিয়েছিলেন।

আরো কিছু দিন পর ভাবীর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। জাফরভাইয়ের কথা শুনলাম। আসমাভাবীর স্বামীর নাম জাফর। ভাবীকে ভাই বলছেন, দুই দিন পর পর **কি** সব ঢঙ আরম্ভ করেছো। চশমা বদল, পোশাক পরিচ্ছেদ পরিবর্তন, কথাবার্তা, চালচলন সব কিছুই একেকবার একেক রকম হচ্ছে। এসবের মানেটা কি? শোনো আসমা, সবই বুঝি এবং কিছুটা শুনেছি। তুমি সম্পূর্ণ তোমার মতো। কারো মতো নও। তোমার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট আছে। সেই মতই তুমি চলবে। অন্যকে কেন তুমি অন্ধের মতো অনুসরণ, অনুকরণ করবে। তোমার জুনিয়ররা তোমার কথা শুনবে, তুমি কেন তাদের কথা শোনো?

আরো কিছু বলছিলেন। কিন্তু আমি আর শুনলাম না। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলাম। আমাদের তেল মর্দন কর্মটি ধরা পড়ে গেছে।

জামালপুর থেকে

প্রেমের সময়ে

দৃষ্টিশক্তি স্বল্পতার জন্য এবং মেডিকালের ছোট ছোট অক্ষরের মোটা মোটা বই পড়ার জন্য আমাকে সব সময় চশমা ব্যবহার করতে হয়। চশমা ব্যবহার করার জন্য আমার কোনো দুঃখ বোধ নেই। শুধু মেডিকাল কলেজে পড়ার সময় মাঝে মধ্যে মনে হতো যদি কখনো প্রেমে পড়ি এবং প্রেমিকের আদরের সময় এই চশমা যদি বাধা সৃষ্টি করে তখন চশমা খুলে কোথায় রাখবো! প্রেমিকের শার্টের পকেটে, নাকি আমার এপ্রনের পকেটে?

পরে ইন্টার্নি করার সময় যখন সত্যিই একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির সবুজাভ কটা চোখের ডাক্তারের প্রেমে পড়লাম তখন আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, চশমা পরে থাকলেও আদরের সময় আমরা চশমার অস্তিত্ব বুঝতেই পারছি না। হতে পারে প্রেমের আবেগ আর আমার চশমার ছোট্ট গোল ফ্রেম–এর কারণ। বরং চশমা খুলে রাখতে গিয়ে কি বিপত্তি হয়েছিল এবার তাই বলবো।

একদিন এক রুমে দুজন গল্প করছি। পাশে টেবিল থাকায় চশমা খুলে সেখানে রেখেছি। হঠাৎ সুযোগ আসায় সে আমাকে আদর করা শুরু করলো এবং ইংরেজি সিনেমার মতো কোলে তুলে নিয়ে Light as feather – পালকের মতো হালকা বলতে বলতে আমাকে টেবিলে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আওয়াজে বুঝতে পারলাম। আমার চশমাটা আর অক্ষত নেই। অতিরিক্ত চশমা না থাকাতে পরের দিন হাসপাতালে গেলাম চশমা ছাড়া। সবার প্রশ্নের উত্তর দিলাম যা আগের থেকে ঠিক করে রেখেছি, চশমা হাত থেকে হঠাৎ পড়ে ভেঙেছে।

কিন্তু আমার কিছুটা রক্তিম আর লাজুক হাসি দেখে দুষ্টু মোস্তাফা বলেই বসলো, বিজ্ঞরা বলেন, প্রেম করার সময় চশমা আর কাচের চুড়ি খুলে রাখবে।

তার কথায় আমি আরো লাল এবং বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম।

মোস্তফাসহ অন্যরা *একটা ধরে ফেলেছি* টাইপ হাসি হাসলো।

মনে মনে ভাবলাম, চশমা খুলে না, পরে থাকাই নিরাপদ।

পরে বিয়ের সময় কন্টাক্ট লেন্স নিয়েছি চশমা ব্যবহারকারী মেয়েরা সাধারণত তাই করে।

কিন্তু আমার প্রেমিক টার্নড স্বামী আমাকে চশমা পরা দেখতেই পছন্দ করে। সে বলে, হানি, তোমাকে প্রথম যেদিন দেখে ভালো লেগেছিল সেদিন তুমি চশমা পরা ছিলে। তোমাকে চশমা পরা দেখলে আমার সেই ভালো লাগার অনুভূতি ফিরে আসে।

সে চাইলেও তাকে সানগ্লাস পরতে দিই না। কারণ তার চোখ দুটো আমার খুব পছন্দের। Baby I love your ways গানের কিছু কথা মনে করিয়ে দেয়। তা হলো –

I can see the sunset in your eyes
Brown and grey and blue besides.

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কানাবাবা

– ছগির মাহমুদ

সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার পর গত দুই বছর রিলে রেসের প্রতিযোগিতার মতো থেমে থেমে শুধু ছুটছি। কর্তৃপক্ষের অনুরাগ, নাকি বিরাগভাজন হওয়ার ফল এটা সে বিবেচনা না করে বরং বদলিজনিত এই ওয়ার্মআপ ম্যাচের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় ফিটনেস অর্জিত হচ্ছে বিবেচনা করি। নতুন বৌ, নতুন চাকরি, অতঃপর নতুন নতুন শহর এবং নতুন নতুন বাসা, মজার অভিজ্ঞতাই বটে।

বন্ধুদের অনেকের মতে, আমার এ চাকরি নাকি নতুন বৌ–এর কপালগুণে। তাই যদি হয় তো মহা বিপদের কথা! ক্রীড়াবিমুখ টাল খাওয়া শরীরের লোক। বিয়েউত্তর নতুন জীবন আর ঘন ঘন বদলির চাকরি তো কোমরের জন্য রীতিমতো ভীতিকর। এক একবার বাসা পাল্টানোর ধকল মানে কোমরের বল বেয়ারিংয়ের দফারফা।

শুধু কোমর নয়, গোমর ফাসের অভিজ্ঞতাও একদিনে হয়েছে কম না। দেশের দক্ষিণ–পশ্চিম অঞ্চলীয় একটি জেলায় কাজ করছি তখন। অফিস থেকে বাসা খুব দূরে নয়। পায়ে হেটে গিয়ে দুপুরে খাবার খেয়ে আসি। সকাল, দুপুর, বিকেল মিলে অন্তত চারবার আসতে–যেতে পথের পাশে নারিকেল গাছে ঝোলানো ছোট একটি শাদা–কালো সাইনবোর্ড চোখ এড়ায় না। *কানাবাবার স্বপ্নে পাওয়া আশ্চর্য তাবিজ।* দুই লাইনে লেখা এই শব্দগুলোর মধ্যে শেষের তিনটি শব্দের হরফগুলো আবার তুলনামূলক অনেক সুস্পষ্ট আর নাদুসনুদুস। উল্লিখিত সুদর্শন শব্দ তিনটির দুই পাশে দুটি করে শৈল্পিক বিস্ময়বোধক চিহ্ন প্রকৃতই আশ্চর্যান্বিত না করলেও এক রকম উৎসুক তৈরি করতো।

সাইনবোর্ডটির নিচের দিকে উক্ত কানাবাবার দরবারে নির্বিঘ্নে পৌছানোর সবিস্তার ঠিকানাও শোভা পাচ্ছে। কাজে–কর্মে মাঝে মধ্যে ওদিকটাতে যেতে হয় বৈকি। এরপর গেলে একবার কানাবাবার আশ্চর্য তাবিজের *মাজেজা* সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান উর্জন করে আসবো স্থির করে রাখি।

জটাবাবা, কানাবাবা, ল্যাংটাবাবাদের প্রতি বৌ–এর ধারণা খুব হাই। তাদের অতি মানবীয় ক্ষমতা বা ক্যারিসমা সম্পর্কে আস্থার ভিতটা নির্ভেজাল বিশ্বাসের গাথুনিতে গড়া। তাই তার সামনে বাবাজির প্রসঙ্গ তুলতেই তাকে বেশ অপার্থিব এক ভাব ও বিশ্বাসের আবহে অচঞ্চল আর সম্মোহিত মনে হতে লাগলো।

এর দিন দুয়েক পর বাবা ও তার স্বপ্নে পাওয়া আশ্চর্য তাবিজের বিস্ময়কর গুণের অনেক কাহিনী তার জবানিতে শুনে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে সক্রিয় চিন্তা–ভাবনা শুরু করতে হলো।

স্থানীয় লোক অফিসের পুরনো পিয়নের কাছ থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, বাবা তার যৌবনদশায় সন্ত্রাস বা ডাকাতির মতো কর্মব্রত পালন করতে গিয়ে কানাবাবা হননি। হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছাই এমন ছিল। কোনো কানা চোখের দিবাস্বপ্ন হয়ে ভেসে উঠবে কোনো এক অতি অসাধারণ গাছের শিকড়–বাকড়, গাজার কলকের ছাই অথবা গৃহপালিত কোনো পশু–পাখির বিষ্ঠা যা কি না পূরণ করবে অন্তরের একান্ত পবিত্র কোনো ইচ্ছা বা স্বপ্ন।

বিয়ের পর বোধ হয় সকলেরই আনকমপ্রমাইজিং অ্যাটিচুড ক্রমেই আপোসমূলক মনোভাবে পরিণত হয়। পারিবারিক জীবনের ছন্দময়তার স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিতেরও হাত ধরাধরি করে পথ চলতে হয়। স্ত্রীর স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে তাই বাবার দরবারে যেতে হলো অবশেষে।

বাবার আরেকটি মোক্ষম নাম হতে পারে *কালাবাবা।* কারণ বাবার গায়ের রঙ এক কথায় নির্ভেজাল কালো। মাথার লম্বা বাবরি চুল, কোমরছোয়া মুখের দাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করেই যেন ত্বকের রঙ গড়ে উঠেছে। এর আগে দেখা বিভিন্ন গদিনসীন বাবাদের দুধে আলতাবরণ তবিয়তের বিলকুল বিপরীত। বাবার চোখে কঠিন কালো রঙের বিশাল চশমা।

বালিশের কনুইয়ের ভর রেখে কাত হয়ে বসে আছেন তিনি। পাশে দুই চারজন একান্ত ব্যক্তিগত চেলা। সামনে আমাদের মতো আরেক জোড়া স্বপ্নপ্রবণ দম্পতি।

বাবা আমাদের শুভাগমন লক্ষ্য করে অগ্রজ দম্পতিদের নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আদেশ দিলেন।

মুষ্ঠিবদ্ধ স্বপ্ন নিয়ে তারা সবিনয়ে প্রস্থান করলেন।

তাদের স্বভাবজাত উপেক্ষা, অবহেলার নীরব অসম্মান থেকে রেহাই পেতে ঝটপট নিজের পরিচয় পরিবেশন করলাম।

হুজুর কৃত্রিম উদাসীনতা ধরে রেখেই ভীষণ অনাদরের সঙ্গে আমাদের বসার জন্য ইশারা করলেন। অতঃপর একটু সময় নিয়ে মনোবাসনা ও আগমনের হেতু বয়ান করার অনুমতি দিলেন।

আমার সঙ্গী ভদ্রমহিলা তার ওষ্ঠাগত বক্তব্য কোনো ভূমিকা ও দ্বিধা ছাড়াই ব্যক্ত করতে তুমুল উত্তেজনায় অস্থির।

তাকে স্থির করতে যেভাবে ইশারা করলাম, নিজের ভেতরেই তা কিছুটা অশোভন মনে হলো। কালো চশমার কানাবাবা দেখতে পাননি বলে রক্ষা। না হলে হুজুর সাংঘাতিক গোস্বা করতেন সন্দেহ নেই। হয়তো সেক্ষেত্রে তিনি আমাদের এমন আশ্চর্য তাবিজ দিতেন যে, আমাদের দুজনার সংঘাতপূর্ণ দুটি পৃথক মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। স্ত্রীর বাকস্বাধীনতা হরণের গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাকে একটু আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে কাছে টেনে জানালাম যে, আমি ওনাকে চিনি।

আমাদের কথাগুলো শুধু বাবা একা শুনবেন মর্মে অনুরোধ করা হলো।

একান্ত গোপনীয় আর লজ্জাকর বিষয় বিবেচনায় হুজুর তার সাঙ্গদের আপাতত ঘরছাড়া করে নড়াচড়া করে বসলেন। এমনো হতে পারে যে, বাবা এতোক্ষণে, যৌন অক্ষমতা জাতীয় রোগের লক্ষণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ভাবছেন। তিনি তার অন্ধ চোখের কালো চশমাটা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে, কান খাড়া করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বোঝা গেল।

বাবাজির নাম ধরে আমি ডাকলাম। পুরনো সেই নাম। দ্রাস্তো তুল্লো শেখ। এবং কুশল জানতে চাইলাম।

বাবা চমকে গিয়ে অস্থির হলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এখানে তাকে এই নামে কেউ চেনে না। এখন সে নতুন নামে সম্পূর্ণ নতুন চেহারায় পরিচিত। প্রায় ছয় বছর তো হবেই তার এ ব্যবসা। পুরনো দ্রাস্তো আজ তার ঘরের লোকদের কাছেও ভুলে যাওয়া কোনো অস্তিত্বের মতো। সে কিছু বলতে পারার আগেই দুই হাত জোড় করে চেহারায় অদ্ভুত এক মিনতি ফুটিয়ে তুললো।

আমার পুরনো প্রতিবেশীকে আশ্বস্ত করলাম, তার ব্যবসার ক্ষতি করবো না।

দ্রাস্তোর কালো চশমাটা ততোক্ষণে চোখ থেকে নেমে গিয়ে তার দুই হাতের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে। এবারে পুরনো বিশ্বস্ত আর নিষ্ঠাবান দ্রাস্তোকে ফিরে পাওয়া গেল। বিনয়ী দ্রাস্তো।

বুনিয়াদী রক্তের ধারা তার শরীরে থাকলেও একজন জল শ্রমিক হিসেবে তার ছিল দারিদ্রপীড়িত কষ্টের সংসার। ডুবুরির কাজ করতো সে। কখনো বা মহাজনের নৌকায় বালি সংগ্রহে যেতো দূরে কোথাও উন্নত মানের পাথুরে বালির খাড়িতে। নদীর তলদেশ থেকে তুলে আনতো বালতি ভর্তি স্বচ্ছ চকচকে বালি।

মহাজনের নৌকায় দৈনিক মজুরির চাকরিতে পোষায় না। তাই ডুবুরির কাজটাই ছিল তার বেশি পছন্দ। স্বাধীন পেশা, শরীর–মন চাইলে করলাম, না হলে না। তুলনামূলক পারিশ্রমিকও ভালো। বেশির ভাগ সময়ে কন্ট্রাক্টে কাজ করতো সে। অনেক সময় বকশিশ–টকশিশও পাওয়া যেতো। এক্ষেত্রে সততার একটি আলাদা দাম আছে। নদীর তল থেকে মূল্যবান খোয়া যাওয়া মালপত্র তুলে দিলে বুকে জড়িয়ে ধরতো কেউ কেউ। অমনটি তো কয়েকবার হয়েছে দ্রাস্তোর জীবনে। অন্য ডুবুরিরা যেমন ডুবে যাওয়া মূল্যবান কিছু

নদীর তলদেশের এক প্রান্ত থেকে সরিয়ে অন্য প্রান্তে রেখে দেয় আর সবার অগোচরে তুলে এনে বেচে দেয় চড়া দামে। এ রকম অসৎ কারবারের ইতিহাস তার চরিত্রে নেই।

সে বছর মস্ত এক ব্যবসায়ীর লাখ লাখ টাকার মালসহ নৌকা ডুবে গেল নদীর ঠিক গভীরতম স্থানে। স্বয়ং কোটিপতি ব্যবসায়ী এসে হাজির তার ভাঙা ঘরের দুয়ারে। বারো রকমের সব মালপত্র নদীর গভীরে পড়ে আছে। সিমেন্টের বস্তাগুলো তুলে আর লাভ নেই। টিনের বান্ডল, টিউবওয়েল, পাম্প মেশিন এগুলো তো তোলা যাবে।

সামনে ছোট বোনের বিয়ে। অনেক টাকার দরকার। দ্রাস্তো রাজি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারলো না সে। কয়েকবার নদীর তলদেশে যাওয়ার পর আর পারলো না। হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল তার। ওখানে ডুব দিতেই চোখ দুটো জ্বালা করে। সারা শরীর পুড়ে যায়। অতঃপর ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসে দুটি চোখ। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে শরীরের চামড়া মরে যেতে থাকে, শাদা হয়ে যায় দুই চোখের মণি।

পরে জানা গেল, ডুবে যাওয়া নৌকায় অন্য সব কিছুর সঙ্গে ছিল কয়েকশ বস্তা গুড়ো চুন। তারই তেজস্ক্রিয়ায় ঝলসে গেছে তার সমগ্র শরীর, মুখমণ্ডল আর দুই চোখের সবটুকু আলো। অতঃপর কালো চশমা চোখে ভিক্ষাবৃত্তি ছিল তার পেশা। সবশেষে তৃতীয়তম চোখটিও অন্ধ হলে স্বপ্নে পাওয়া আশ্চর্য তাবিজের এই ব্যবসা।

খুলনা থেকে

আতংক

– নাসিম

বেশ কিছু দিন যাবৎ শিলাকে বেশ মনমরা মনে হয়। কথা কম বলে। হাসলেও হাসিতে তেমন একটা উচ্ছল ভাব নেই। শিলার এসব লক্ষণ দেখে আমার খারাপ লাগে। মনে হয় তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি তার সমস্যাটা কি। কিন্তু জিজ্ঞাসা আর করা হয়নি।

এর মধ্যে একদিন শিলার চোখে চশমা দেখি।

চশমা দেখে আমি তো অবাক! বললাম, চোখে চশমা কেন?

শিলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে কথা বলা শুরু করলো। বেশ কিছু দিন যাবৎ মাথা ব্যথা। পড়তে সমস্যা হয়। তাই চোখের ডাক্তারের কাছে আব্বু নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার কিছু ওষুধ খেতে বলেছেন এবং চশমা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

শিলার চোখে চশমা আমার কাছে তেমন একটা ভালো লাগছিল না। তার মানে শিলাকে চশমা ছাড়া বেশি পছন্দ করি। আমি যে শিলার চশমা মেনে নিতে পারছি না হয়তো বা শিলা বুঝতে পেরেছে। ফলে শিলা মনে মনে কষ্ট পেতে পারে। তবে সত্যি বলতে কি যেকোনো অবস্থাতে শিলা আমার কাছে *নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার।*

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস! এক বছর যেতে না যেতেই সেই সমস্যায় আক্রান্ত হলাম। আমার অবশ্য মাথা ব্যথা কয়েক বছর আগ থেকে শুরু হয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেয়েছি এবং ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু এবার ব্যথার ধরন আলাদা। কপাল জুড়ে এবং চোখের ওপর দিয়ে ব্যথা করে।

একজন এম.বি.বি.এস আমাকে পরামর্শ দিলেন একজন ভালো চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য।

চোখের ডাক্তার সব কিছু বিবেচনা করে আমাকে অবশ্যই চশমা ব্যবহার করতে বললেন।

চশমার কথা শুনে আমার মন আতকে উঠেছিল। কারণ ব্যক্তিগতভাবে চশমা ব্যবহার তেমন একটা পছন্দ করি না। কিন্তু এবার আমাকেই চশমা ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু উপায় নেই, তাই এবার চশমা

ব্যবহার করতেই হবে। যতোবার চশমার কথা ভাবছিলাম ততোবারই শিলার কথা মনে পড়ছিল। আমার চোখে চশমা দেখলে শিলা কি যে বলে।

হায় শিলা! আমি এখন কি করবো।

টাঙ্গাইল থেকে

ম্যাডাম

– বিভা চৌধুরী

আমার দাদু কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিওয়ালা পৌঢ়া। একদিন তিনি চশমা পরে পত্রিকা পড়ছিলেন।

প্রশ্ন করলাম, কোনো কিছু পড়ার সময় চশমা পরেন কেন দাদু?

উত্তরে দাদু বললেন, ওটা তুই বুঝবি না।

কিন্তু না, আমি বুঝতে চেষ্টা করি। চশমাটা নিজে চোখে দিয়ে পড়া শুরু করি। অমনি মাথাটা ঘোরা শুরু করে এবং এই প্রথম জানলাম চশমার মধ্যে এ রকম অবস্থা থাকে অর্থাৎ পাওয়ার থাকে।

এরই মাঝে দাদু বলছিলেন, তোকে দেখে ম্যাডাম ম্যাডাম লাগে।

উহ! কি যে আনন্দ লেগেছিল। আমার ভীষণ দুর্বলতা এসে গেল চশমায়।

মজার ব্যাপার চশমা নিয়ে ফেললাম। চশমা পরে একদিন বাজারে গিয়ে কাচাবাজার করে ঘরে ফিরছিলাম।

এর মধ্যে এক পরিচিত আপার সঙ্গে দেখা। বললেন, কোন স্কুলে আছেন?

আপার এ কথাটির সঙ্গে দাদুর ম্যাডাম বলার মিল খুজে পেলাম। উত্তরে সত্য কথাটি বলার ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারিনি। কেননা ম্যাডাম শুনলে আমার খুব ভালো লাগতো।

সে ভালো লাগার অনুভূতি যেন আলাদা ভালো লাগায় অন্ধ হয়ে ওই আপাকে একটা স্কুলের কথা বলে দিলাম। হতে পারে এ ভালো লাগা যথেষ্ট নয়।

এমনিতে আমাদের দেশে যে কোনো ভালো শাড়ি পরা মহিলাকেই ম্যাডাম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু চশমা পরা ম্যাডাম যেন কোনো স্কুল শিক্ষিকা কিংবা কলেজ অধ্যাপককেই মনে হয়। অনেকের ভিন্নমত থাকতে পারে। তবে আমার এটাই মত।

ম্যাডাম শোনার ইচ্ছে থাকলেও সত্যি সত্যিই দাদুর মতো পাওয়ার চশমাই নিতে হয়েছে। এতে বেশ ঝামেলা হয় বটে কিন্তু এই ম্যাডাম কথাটি শোনার জন্য এটি ব্যবহার করে চলেছি।

আমার কথাগুলোর মধ্যে যুক্তির বিরোধিতা থাকলেও চশমা এবং ম্যাডামের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই, বরং একে অপরের সহায়ক বলে মনে করি।

গাইবান্ধা থেকে

টাকার মায়া

– আনিছ

১৯৯৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি দেশের সকল মায়াজাল ছিন্ন করে উড়াল দিলাম মরুভূমি কাতারের উদ্দেশ্যে। দোহা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে বিমান ল্যান্ড করার পর দুই তিনজন বিমানমালা আমাদের দরজায় দাড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালো। কিন্তু যাত্রীদের অনেকের এবং বিমানবালাদের হাতেও সানগ্লাস দেখে প্রথমে বেশ অবাক হলাম।

পরে বিমান থেকে নেমেই বুঝতে পারলাম এই সানগ্লাস রহস্য। রোদের তীব্রতা এবং লু হওয়ার এতোই তীব্রতা মনে হচ্ছে যেন পুরো মুখটা পুড়ে যাবে। ফেব্রুয়ারি মাসেই এ অবস্থা! অথচ এখানে যারা দীর্ঘ দিন আছে তারা বললো, এটাতো কোনো গরমই না।

এটা যে গরম না সেটা আমিও বুঝলাম। জুন জুলাই মাসে এর তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশেও গরম পড়ে। কিন্তু বিশাল গাছ এবং চারদিকের সবুজের সমারোহ সেই গরমটাকে অনেক সহনীয় করে তোলে।

আর বিপরীতে কাতার! একে তো মরুভূমি, তার ওপর বিশাল হাইরাইজ বিল্ডিং, শপিং মল, বাড়ি, গাড়ির এসি–র গরমে দেশটির গরম হয়ে ওঠে আরো চরম।

আমি কাজ করি *পিজা হাট*–এ। পিজা ডেলিভারি দেয়াই আমার কাজ। এ কারণে এখানকার নানান শ্রেণীর মানুষের বাড়িতে যেতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী আমাদের পরিপাটি থাকতে হয়।

পিজা হাট রেস্টুরেন্ট সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। প্রচণ্ড গরমে রোদের তীব্রতায় চোখ খুলে গাড়ি চালানো অনেক কষ্টসাধ্য। একটা সানগ্লাস ভীষণ জরুরি হয়ে পড়লো। ছুটির দিনগুলোতে বিভিন্ন শপিং মলে গিয়ে সানগ্লাসের দরদাম দেখে ফিরে আসি। কারণ সানগ্লাসের ভীষণ দাম যা আমার মতো গরিবের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে।

জুলাইয়ের গরমে বাইরে বের হওয়াটাই দুঃসাধ্য। চোখ দুটো রোদের কারণে ছোট করে রাখতে হয়। পিজা ডেলিভারি দিতে গিয়ে যে টিপস পাই তা সঙ্গে তুলে রাখি। প্রতিদিনই গণনা করি আর স্বপ্ন দেখি কবে হবে সে টাকা যা দিয়ে কিনতে পারবো সানগ্লাস।

দীর্ঘ নব্বই দিনের টিপসের পয়সা জমিয়ে অবশেষে গেলাম কাতারের সুবিশাল শপিং মল *সিটি সেন্টার*। অনেক দামের সানগ্লাসের ভেতর দুইশ চল্লিশ রিয়াল দিয়ে একটা সানগ্লাস কিনলাম। আমার সানগ্লাসটি Police (পুলিশ) ব্র্যান্ডের।

দুইশ চল্লিশ রিয়াল–কে যখনই বাংলাদেশ টাকায় গণনা করি তখন বুকটা চিনচিন করে। রোদ থেকে বাচার জন্য টাকার মায়া ছাড়তে হলো।

দোহা, কাতার থেকে

কলসি কাখে

– মোহাম্মদ অয়েজুল হক

কালো সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে লুচ্চারা পলকহীনভাবে তাকিয়ে থাকে সুন্দরীদের দিকে। কেউ বা পোড়া চোখে চশমা লাগিয়ে স্বপ্ন সাজায়, স্বপ্ন আকে। বিরোধী দল পাওয়ারফুল চশমা লাগিয়ে সরকারি দলের দোষ খোজে। বৃদ্ধ বাবা চশমা চোখে পার করা অতীতকে ভাবেন। কেউ আবার চমশা চোখে চাদ দেখে।

একদিন রাত বারোটার দিকে আনিতার চোখে কালো সানগ্লাস দেখে তো অবাক! সুন্দরীদের কাছে আবার সত্যটিও প্রকাশ করতে ভয় হয় অপ্রিয় হবার ভয়ে। মেয়েরা এখন যে বজ্জাত হয়েছে! মিষ্টি হাসি দিয়ে নিরেট মিথ্যাকেও সত্য বানিয়ে দেয়। এখানেও তাই হলো।

বললাম, আনিতা, রাতের বেলা সানগ্লাস চোখে!

আরে কি বলেন। এটা হলো মুনগ্লাস। কম্পানি নতুন বের করেছে। চাদের অপার সৌন্দর্যকে হাড়ে হাড়ে উপভোগ করার জন্য এই চশমা।

ও হো। সরি।

এক বর্ষণমুখর দিন। সূর্য রশ্মির প্রচণ্ড তীব্রতা নেই। থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। রিমঝিম, ঝিমরিম। ছন্দের তালে কর্কশ কণ্ঠে মাঝে মধ্যে গেয়ে উঠছে বজ্রপাত। কড় কড়াৎ গুড় গুড়ুম। নদীতে উল্টা-পাল্টা ঢেউ।

দিন শেষ হতেই লঞ্চে গিয়ে উঠলাম। লং ভ্রমণ। ভৈরবের বুক চিরে সারা রাত ধরে চলবে লঞ্চ। সকালবেলা যখন সূর্যের চকচকে আলোক রশ্মি পূর্ব দিগন্ত থেকে ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীময় তখন গন্তব্যে পৌছাবো। ইদানীং আবার চকচকে আলোর পরিবর্তে ঝপঝপে বৃষ্টি পড়ে। কালো মেঘে ঢাকা থাকে আকাশ। জানি না কাল সকালে কি দেখবো! বৃষ্টি কি রোদ যে কোনো একটি দেখতে আমার আপত্তি নেই। ভৈরবের নদী গর্ভে ঢুকে যেন না যাই ওগো বিধাতা!

কোথায় ঢুকছেন ভাই?

চমকে পেছনে তাকালাম।

হে, হে শুনে ফেলেছেন।

দাত কেলিয়ে একগাল হাসলাম।

শুনে ফেলেছি মানে? আপনার সঙ্গে ঢোকার জন্যেও আমি প্রস্তুত।

এই ত্যাগী মানুষটির দিকে তাকালাম। চোখে কালো রঙের সানগ্লাস। মাথায় বড় চুল, খোপা করে বাধা। চাদের হালকা, স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। লঞ্চের ছাদে আমি আর ওই মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ নেই।

আপনার নাম কি? প্রশ্ন করলাম।

গাওসিয়া, জবাব দিল মেয়েটি।

গাওসিয়া! গাওসিয়া মার্কেটের মতোই সুন্দর আপনি।

হোয়াট?

বুঝলেন না। জাকজমক আর কি! বাহ্যিক ফ্যাশন। চোখে চশমা। একপাত্তা মেকআপ দিয়ে চামড়া ঢাকা। কানে দেড় মণ ওজনের দুল। নাকে নাকফুল। চমৎকার করে লিপস্টিক মেখে ঠোট দুটোকে করেছেন গোলাপের পাপড়ির মতো। এবড়ো-খেবড়ো উইপোকা খাওয়া নখগুলোকে নখ পলিশ দিয়ে করেছেন অনিন্দ্য সুন্দর।

ননসেন্স।

লঞ্চ ইদানীং খুব ডুবছে ম্যাডাম। সেন্স থাকাটাই অস্বাভাবিক। দোয়া করুন সেন্সহীন লঞ্চটি যেন ডুবে না যায়। ডুবলে আপনার চশমা ভেসে যাবে। মেকআপ ধুয়ে যাবে। আপনাকে বাদরের মতো দেখাবে।

মেয়েটি তবুও চলে গেল না। অনেক সময় নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকার পর বললো, এসেছিলাম মুক্ত বাতাসে আপনার সঙ্গে গল্প করার জন্য। কিন্তু বুঝতে পারিনি আপনি কি এমন...।

মেয়েটির কথা শেষ হতেই তার চশমা খুলে ছুড়ে দিলাম নদীর মাঝখানে। ঝুপ করে বোধহয় একটু শব্দ হলো।

মেয়েটি নির্বাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার চোখে চোখ রেখে বললাম, আপনি খুব সুন্দর। তবে কেন সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা! আচ্ছা বলুন তো, প্রকৃতি সুন্দর, নাকি সভ্যতার দালান-কোঠা!

আল্লাহর সৃষ্টি সুন্দর। আস্তে আস্তে জবাব দেয় গাওসিয়া।

আপনি খুব সুন্দর গাওসিয়া। উদার, মুক্ত, বিস্তৃত আকাশের মতো সুন্দর।

গাওসিয়া এবার হাসি দিল। মৃদু হাসি। বললো, আমার চশমা!

কাল সকালে কলসি কাখে একজন পানি নিতে এসে ওটা পাবেন। বাড়ি ফিরবেন কলসি কাখে নিয়ে চশমা চোখে দিয়ে। বলুন তো কেমন হবে দৃশ্যটা।

কলসি কাখে, চশমা চোখে। বলেই হেসে ফেললো গাওসিয়া।

উত্তর বণিকপাড়া, খুলনা থেকে

হালাল

– তারিক সাইফুল ইসলাম সোহেল

অহংকার ধ্বংসের সূচনা করে কথাটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেও আমার একটা অহংকার আছে। তা হলো আমার বাবার সততা নিয়ে। দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে বাগেরহাট জেলার একটি বেসরকারি কলেজের পৃন্সিপাল হিসেবে কর্মরত তিনি।

যখন থেকে বাবাকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই দেখেছি কালো রঙের এক মোটা ফ্রেমের চশমা তার চোখে। অত্যন্ত সুদর্শন চেহারার বাবার চোখে দারুণ মানাতো চশমাটি। মাঝে মধ্যে চশমাটি চোখে দিয়েই নামিয়ে ফেলতাম। খুব পাওয়ারফুল। তাই কিছুই দেখতাম না।

আমার শিক্ষক বাবা আমাদেরকে ভালো বাড়িতে রাখতে পারেননি। দামি পোশাক পরাতে পারেননি, পারেননি গাড়িতে চড়াতে। কারণ যে বেতন পেতেন তা দিয়ে আমাদের পড়াশোনাসহ সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হতো বাবাকে। তবুও তিনি নিজের সততা, নৈতিকতা তথা চরিত্রকে বিসর্জন দেননি। সে জন্য আমার মনে হয় কালো রঙের মোটা ফ্রেমের চশমাধারী বাবা বর্তমান নষ্ট হওয়া সমাজের একজন আদর্শ মানুষ।

আমি যখন উচ্চ শিক্ষার্থে ঢাকা আসি তখন আমার বাবা আমাকে অনেক উপদেশ দেন। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, নিজেকে বিক্রি করবে না, সততা ও নৈতিকতা বিসর্জন দেবে না।

ঢাকায় বর্তমানে টিউশনি করাই। চেষ্টা করি সেখানেও বেতনটা শতকরা একশ ভাগ হালাল করতে।

হঠাৎ আমার চোখে সমস্যা দেখা দিল। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চশমা নিলাম। বর্তমান যুগে প্রায় অচল মোটা ফ্রেমের চশমা না নিয়ে রিমলেস চশমা নিলাম গোল্ডেন কালারের।

নতুন চশমা পরে বাড়িতে গেলে বাবা আমাকে আলাদা ডেকে নিলেন। আমার চশমাটা হাতে নিয়ে কৈফিয়ত চাইলেন, এই দামি চশমায় কোনো হারাম টাকার স্পর্শ আছে কি না?

চশমাটা ফেরত নিয়ে শুধু একটা কথাই বলেছিলাম, বাবা, আমি তো তোমারই সন্তান।

বাবা আর কোনো প্রশ্ন করেননি।

ঢাকায় আসার সময় বাবাকে বললাম, তাকে আমার মতো রিমলেস চশমা কিনে দেবো।

শুনলেন না তিনি। বললেন, এই মোটা ফ্রেমের চশমা পরেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন।

অনেক অনুরোধের পর আমার কাছ থেকে টাকা নিলেন, চশমার নতুন ফ্রেম কিনবেন।

যাহোক, গত মে মাসে বাগেরহাট গিয়ে দেখলাম আমার টাকায় নতুন চশমা কিনেছেন। বলা বাহুল্য, সেই মোটা ফ্রেমেরই চশমা। তবে এবার রঙটা পরিবর্তন করেছেন। আগে ছিল কালো রঙের ফ্রেম, এখন গাঢ় খয়েরি রঙের।

ঢাকা থেকে

অতি আদরের

– ফারাহ আজাদ দোলন

ছোটবেলা থেকে একটা বিষয়েই নেশা ছিল। তা হলো বই পড়া। তাও যতো না পাঠ্যপুস্তকে মন তারচেয়ে বেশি গল্পের বইয়ে। সোজা পথে সাপ্লাই পর্যাপ্ত না হওয়ায় বই চুরি করতে মাঝে মধ্যে হানা দিই পালাক্রমে তিন মামার লাইব্রেরিতে, *নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রগতি প্রকাশন* এবং রাজশাহীর *ন্যাশনাল* লাইব্রেরিতে। ফলে বিলক্ষণ মাতৃদেবীর গোয়েন্দাগিরি এবং ধরা পড়লেই চোখ রাঙানি। তাই সময়ের ফাকফোকর গলিয়ে চুরি করে বই পড়া। খেলার সময় বই। রাতে বাসায় গেস্ট। সুবর্ণ সুযোগে আমি ছাদে, হাতে বই। ভরসা চাদের আলো না হলে হারিকেনের আলো।

মায়ের মুখের কথা সত্য প্রমাণিত করে চোখের বারোটা বাজলো। সেটা বুঝলাম আবার বেশ দেরিতে। ইউনিভার্সিটিতে যাবার পর দেখলাম সবাই বোর্ডের লেখা দেখে নোট তুলছে, আমাকে শুধু কানের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

একদিন চশমা এলো চিরসঙ্গী হয়ে। দেখলাম প্রকৃতির নতুন রূপ। অর্থাৎ এতো দিন যা ছিল ডিসঅর্ডার এখন তা হলো অর্ডার। আমি তো মহা আনন্দিত।

যেহেতু চশমা ছাড়া আমার এক মুহূর্তও চলে না, আমার সেই সবচেয়ে কাছের সঙ্গীকে নিয়ে ঘটনা তো কিছু ঘটবেই। যেমন ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্টাডি টুরে গিয়েছি। সহপাঠী এবং অন্যান্য স্যারদের সঙ্গে আছেন তৎকালীন চেয়ারম্যান জাদরেল আবদুল কাদির ভূইয়াস্যার। বর্তমানে খুলনা ইউনিভার্সিটির ভিসি। এই স্যার সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যার নাম শুনলে *বাঘে ছাগলে* (গুণ্ডা ছাত্র এবং নিরীহ ছাত্র) এক ঘাটে পানি খাওয়ার মতো অবস্থা। সে বছর গিয়েছি কক্সবাজার।

একদিন দুপুরে *নিরিবিলি* গোছের নামের একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করে বাসে উঠেছি। আমাদের ত্রিরত্নের (মুন্নী, সোহেলি এবং আমি) আবার সামনের থৃ সিটটাই চাই। বসার পর বাসটা কেবল ছেড়েছে, অমনি চিৎকার জুড়ে দিলাম। আমার চশমা আমার চশমা।

স্যার বললেন, কি হয়েছে তোমার চশমার।

বললাম, স্যার, রেখে এসেছি রেস্টুরেন্টের টেবিলে।

স্যার বললেন, এই বাস থামাও। ছেলেরা একজন গিয়ে তার চশমাটা আনো।

সম্ভবত সাথী শাকিল রেস্টুরেন্ট ঘুরে ফিরে এলো খালি হাতে।

আমি ভগ্ন মনোরথে সিটে বসতেই পাস থেকে মুন্নী বললো, এই শয়তান, চশমা তো তোর চোখেই।

বোকা হয়ে গেলাম সকলকে হ্যারাস করার জন্য।

শুনতে পেলাম ভুইয়াস্যারের গমগমে গলা। এই মেয়ে, সোশিওলজি পড়তে এসেছে কেন, এ্যা। এর উচিত ছিল ফিলোসফি পড়া।

বস্তুত আমার এমন কাজ–কারবার আরো বহুত আছে। কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু চশমা। তাই এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো।

চশমা নিয়ে আমার খেয়ালিপনা এমন চলতেই থাকলো। যেমন শাওয়ারে দাড়ালাম চশমা চোখে। হয়রান হয়ে চশমা খুজছি, ছোট মেয়ে আনুশকা হয়তো বললো, মামণি চশমা তো তুমি পরেই আছো।

আমি দুটো চশমা রাখি। প্লাস্টিক গ্লাসটা হালকা বলে ঘরে ব্যবহারের জন্য। আর গোল্ডরিমটা রোদে শেডের কাজও করে, ফ্যাশনও হয়। কখনো কখনো প্লাস্টিক গ্লাসটা বাসাতেই হারাই। তখন গোল্ডরিমটা পরে খুজতে হয়। কারণ ওটা আবার আমি খালি চোখে দেখতে পাই না।

এই অতি আদরের চশমাদের একজনকে আবার চুরি করেও নিয়েছিল এক চোর ইলেকট্রিশিয়ান। কাজ শেষে যাবার সময় টিভি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গেল ওভালশেপের নতুন অলগাটা। আর আমি পুরনো স্কোয়ার শেপ অলগা পরে বাইরে থেকে ঘুরে এলাম। ভাবলাম নতুনটা যদি পরে যেতাম তাহলে হয়তো ব্যাটা ওভাবে চুরি করতো না। আমার প্রিয় ব্র্যান্ড ছোট ফ্রেমের অলগা।

এ ঘটনার পর থেকে একটা অলগার জায়গা দখল করলো রিমলেস প্লাস্টিক গ্লাস।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

রেশমা

– খসরু তালুকদার

আজ জীবনের পঞ্চাশের কোঠায় দাড়িয়ে অতীতের চশমা স্মৃতি রোমন্থনের প্রয়াস পাচ্ছি। বাবার ঘনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে জন্মেই দেখেছি বাবার চোখে চশমা। এবং আমার চশমা পরিচিতির প্রথম ধাপ। রাশভারী বাবা, চশমায় হাত দিতে সাহস হয়নি। তবে কৈশোরে একদিন বাবার অনুপস্থিতিতে তার চশমা পরে, পান মুখে পুরে, চেয়ারে বসে পাটসোলার সিগারেটে আগুন দিয়ে বাবায়ী মুদ্রায় টানছিলাম। এবং এই অনুকরণ ধাচের কৃত অপরাধে মায়ের হাতে কানমলা খেয়েছিলাম। তাছাড়া ওই বয়সে তালপাতার চশমা ও মেলায়ী চশমা ছাড়া আর কোনো সত্যিকারের চমমা চোখে পড়েনি।

ম্যাট্রিক পাস করে সিরাজগঞ্জ কলেজে ভর্তি হলাম। ট্রেনে ক্লাস করতে হয়। জামতেল রেল স্টেশনের কাছে মামাবাড়ি থাকার ব্যবস্থা হলো। কলেজে পড়ি মার্কা ভারিক্কিতে পেয়ে বসলো। হাইকলার খদ্দরের পাঞ্জাবি, চোস্ত পায়জামা, চশমা হলে খুবই ভালো হয়। *কিন্তু মাইনসে কি কইবো,* মনের বাধায় কেনা হয় না।

এদিকে মামার ক্লাস এইটে পড়ুয়া কন্যা রেশমা ও ক্লাস ওয়ান পড়ুয়া আসমাকে মাস্টারি মুদ্রায় একটু–আধুটা পড়া দেখিয়ে দিই। ছোটটির বেলায় না হলেও বড়টির চোখে চোখাচোখিতে মনে লজ্জা হয়। ভাবি, চশমা থাকলে এ লজ্জা থেকে রেহাই পেতাম।

একদিন ছোটটা এলো একা পড়তে। আদর করে বললাম, তুমি খুব সুন্দর।

ও শিশুসুলভ ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, *অ্যা, আপনেই সুন্দর। আমার বুবু কইছে রেবা, রোজি, ঊষাবুবুদের কাছে।* আপনার মুখ, নাক, চুল সুন্দর। সবচেয়ে চোখ বেশি সুন্দর ইত্যাদি।

ছোটটির মুখে বড়টি কর্তৃক আমার চোখের প্রশংসা আমাকে চোখের সৌন্দর্য বর্ধনে আরো যত্নবান করে তুললো। জানি না এগুলো কামরতির ফুলশর নিক্ষেপ কি না। তবে চশমা আমার একখান চাই–ই চাই সম্পৃক্ত চিন্তায় রাতে ঘুম হলো না।

পরদিনই চশমার টাকা জোগাড়ের উদ্দেশ্যে বাড়িমুখী হলাম। সেখানে মায়ের মুখ দেখে, সংসারের হাল বুঝে আর টাকা চাইতে পারলাম না। এদিকে দেখি পাড়ায় ধর্মসভা অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন। আমার সমবয়স্ক গ্যাদা, নুরাল সারোয়ার, ইসমাইল সবাই গেছে সিরাজগঞ্জ জাহাজঘাটে খোরাসানি হুজুরকে এগিয়ে আনতে। তিনিই প্রধান বক্তা।

দুপুরে হুজুর এলে আমিও তার খেদমতে পেশ হলাম। ইরানি হুজুরের গায়ের রঙ ও পোশাকের জৌলুসে শুধু আশ্চর্যই হচ্ছিলাম। তার চশমা দুখানা। একখানা ভারী ও রঙ কালো, অন্যখানা হালকা, সোনালি ফ্রেমের, সম্ভবত পাওয়ার শূন্য।

পরদিন বিকেলে সভা আরম্ভ হবে। কিন্তু সকালে শোনা গেল হুজুরের হালকা চশমাখানা পাওয়া যাচ্ছে না। চশমার জন্য হুজুরের তেমন উদ্বেগ দেখা গেল না। তবে খাদেম মকবুল মুন্সি চোর ধরার মোক্ষম টোটকা

তার চাল পড়ার ক্যারদানি দেখাতে সবাইকে চাল পড়া খেতে দিল। ফল কিছুই হলো না। শেষে একটু চোর চোর সাইজের গ্যাদার অতীতের ফল-ফলসী চুরির রেকর্ড পর্যালোচনা করে *এ কাম গ্যাদাই করছে*, গোছের মন্তব্য করে চোর ধরা পর্ব শেষ হলো।

পরদিন মায়ের দেয়া পাচটি টাকা নিয়ে যাচ্ছি মামাবাড়ি। রাস্তায় দাড়িয়ে গ্যাদা। বললো, আমি তোকে একটা জিনিস দিমু।

বললাম, কি?

সে বললো, *ওই চশমা, শালা দিছি মাইরা।* তুই তো অন্য গ্রামে থাকোস, কাজেই কেউ জানবো না, বুঝলি? বান্দার মনমণি, খোদার মেহেরবানী। তাই পাচ টাকা হাদিয়ায় কিনলাম চশমা, প্রত্যাশা রেশমার প্রশংসা প্রাপ্তি।

অধিকারাধীন বস্তুর বিড়ম্বনা প্রথম দিনই বুঝলাম যেদিন চশমা পরে কলেজগামী হলাম। বার বার আয়নায় দেখে গাড়ি ফেলের যোগাড়। স্টেশনে পৌছা মাত্র সহাপাঠীদের *কিরে, এমন উমদা মাল কইথ থেইকা কদ দিয়া কিনলি* গোছের কথা শুনতে শুনতে ট্রেনে উঠলাম। সেখানে বসে চশমার প্রয়োজনীয়তা, অর্থ প্রাপ্তির উৎস ইত্যাদির ময়না তদন্তে হলো।

মুখফোড় বন্ধু বাবুল বললো, *নাকি কুনুহান থেইক্যা মাইরা দিছস দোস্ত?*

আমার বলার কিছু ছিল না।

ট্রেনে ফকিরনি কাম পাগলি বুলি ধরে, *ও আমার চশমাওয়ালা ব্যাটা, এক ট্যাহাদে ব্যাটা*।

চশমার সুবাদে গচ্চা এক টাকা।

বাড়িতে কারো চোখ উঠলো, এসে বলবে, *ও ভাইগনা, দেও তো তোমার চশমাখান, দুই দিন চোখ ঠাণ্ডা করি*।

রাগ হয়। তবুও দিই। তবে রেশমার যেদিন চোখ উঠলো সেদিন তাকে চশমা সম্প্রদানে বড়ই কৃতার্থ হয়ে গেলাম এবং বুঝলাম চশমা কেনা সার্থক হলো।

একই বছরে রেশমা ম্যাট্রিক ও আমি আইএ পাস করলাম। বাবা-মা ছোট ছেলের বৌ দেখে মরার শখে রেশমাদের সঙ্গে এমনভাবে আত্মীয়তা পাল্টিয়ে ফেললো যে, রেশমার শেষের মা উচ্চারণ আমার ধর্মমতে জায়েজ রইলো না।

ওই বছরই আরম্ভ হলো মুক্তিযুদ্ধ। স্টেশন ঘেষা গ্রাম। পাকেরা এলো, সঙ্গে রাজাকার। রেশমাকে নিয়ে দিলাম দৌড়। ভুলে গেলাম চশমার কথা। কিছু দূরে গিয়ে স্মরণ এলেও আসল ফেলে উপলক্ষের দিকে এগোলাম না। দিল আগুন, পুড়লো গ্রাম। হারিয়ে গেল আমার স্মৃতিময় সাধের চশমাখানা।

আবার বাধ্য হয়েছি চশমা কিনতে। তবে প্রেক্ষিত স্বতন্ত্র। রেশমা সহাস্য টিটকারি দিল চশমার আড়ালে যেন মিটিমিটি চেয়ো না আবার।

ছোট মেয়ে প্রভামণিকে পড়াতে নিয়ে এই কয়দিন আগে রেশমা বললো, বইয়ের ছোট অক্ষর খুবই ঝাপসা দেখি গো। বুঝলাম চাইলশার ঘোর।

দেখালাম ডাক্তার, কিনে দিলাম চশমা। ফলে আজ দাড়ালো -

আমি ও আমার রেশমা

উভয়েই পরি চশমা।

উপশহর, রাজশাহী থেকে

চশমুদ্দিন

– রুমা

আমরা যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম তখন কিছু ছেলেকে প্রায়ই দেখতাম স্কুলে যাওয়ার পথে। তাদের মধ্যে একজনকে প্রায়ই দেখা যেতো। নাকের ডগায় সারাক্ষণ চশমা ঝোলানো থাকতো। আমাদের কয়েক বান্ধবীর কাছে ওই চশমাটাই ছিল এলার্জি। তার পাশে দিয়ে যাবার সময় দাড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে আমরা বিভিন্ন কথা টুকটাক ছুড়ে দিতাম অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে।

একদিন আমরা ছেলেটার নাম দিলাম *চশমুদ্দিন।* তারপর থেকে তিন বান্ধবী ছেলেটার সামনে পড়লেই এ নাম ধরে একে অপরকে ডাকতাম, টোকাটুকি করতাম কিংবা পরস্পরকে বলতাম, এই, আমি কি চশমা পরি?

ছেলেটা একটু লজ্জা পেতো। আমাদের এক বান্ধবীকে ডেকে সে একদিন বলেছিল, তোমার বান্ধবীরা যেন আমাকে আর ওই নামে না ডাকে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। বিশেষ করে আমি বেশি জ্বালাতন করতাম। হঠাৎ একদিন দেখি ছেলেটা আর চশমা পরে না। বান্ধবীকে বললাম, কি রে, চশমুদ্দিনের চশমা কোথায় গেল?

পিয়াল বললো, তোরা সারাক্ষণ রাস্তাঘাটে জ্বালাতন করিস, তাই।

তারপর অনেক দিন দেখা নেই। একদিন এসএসসি পাস করে কলেজে গেলাম। সেখানে তার সঙ্গে পরিচয় হলো। নাম জানলাম শামীম। আমি প্রথম দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু শামীমভাই মনে হয়, আমাদের চিনতে পারেননি যে, ওই দুষ্ট মেয়েগুলোর মধ্যে আমিও ছিলাম। পরে জেনেছিলাম চোখে সমস্যার কারণে চশমা পরতে হতো তাকে। অথচ আমাদের জন্য তাকে চশমা খুলতে হয়েছে।

মাঝে মধ্যে মনে হয় ক্ষমা চাই। এখনো খারাপ লাগে যে, আমার কারণে চোখে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি চশমা ব্যবহার করতে পারেননি। জানি না তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন কি না?

তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ থেকে

পচা কলা

– এস. এম কবির

১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সাল। আমরা ইকনমিক্স অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। পিকনিকে যাবার প্রস্তুতি চলছে। সিদ্ধান্ত মতো সকাল সাতটার মধ্যে ক্যাম্পাসে উপস্থিত হলাম। গাড়ি সাড়ে সাতটায় ছাড়ার কথা। কিন্তু সকাল প্রায় আটটা বাজতে চললো। গাড়ির কোনো হদিস নেই।

এক সময় অপেক্ষার পালা শেষ হলো। গাড়ি এলো। আমরা যারা পিকনিক কমিটিতে আছি তারা বাদে সবাই মোটামুটি সিট দখলের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হলো। খুব দ্রুত আমরাও জিনিসপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি সাড়ে আটটায় ছাড়লো।

পিকনিকের নির্ধারিত স্থান ছিল মংলা বন্দর ও সুন্দরবন। গাড়ি যশোর শহর ছেড়ে নওয়াপাড়া বাজারে পৌছালে নাশতার প্যাকেট বিলি শুরু হয়। আগের দিন রাতে কয়জন মিলে নাশতার প্যাকেট তৈরি করেছিলাম। এবং সকল প্যাকেট একটি বড় ব্যাগে রেখেছিলাম। এতে একটা সমস্যা হলো। নিচের প্যাকেটের কলাগুলো নরম কাদার মতো হয়ে গিয়েছিল।

আমিসহ জুয়েল, মিন্টু ও অন্যান্য যারা সার্বিক দায়িত্বে ছিলাম তারা সিট পাওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারিনি। তাই আমাদের ভাগ্যে জুটলো ইঞ্জিন কভার। আমাদের মুখোমুখি বসেছিল দুই স্যার, মমিনউদ্দীন ও নাসিম রেজা। সবাই নাশতা শুরু করেছি। কলা খেতে বেশ বিরক্তি হচ্ছে। অনেকে সেটা

ফেলে দিচ্ছে। এমন সময় ভেতর থেকে কে যেন ওই নরম কাদার মতো কলা ছুড়ে বাইরে মারলো স্যারদের পাশের খোলা জানালা দিয়ে। কিন্তু ঘটনা উল্টো দিকে মোড় নিল। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িতে হাসির রোল পড়ে গেল। তাকিয়ে দেখি ওই পচা কলা মমিনস্যারে চশমায় একেবারে লেপ্টে আছে। মমিনস্যারের পাশে বসা নাসিম রেজা স্যারও সবার সঙ্গে সমান তালে হেসে চলেছেন।

স্যারের দিকে তাকিয়ে দেখি রাগে স্যারের মুখ লাল।

এ অবস্থা দেখে হাসবো, কি কাদবো বুঝতে পারছিলাম না। আসলে ছেলেটি কলা ছুড়ে বাইরে মারলো নাকি স্যারের চোখে মারলো বোঝা গেল ঘটনার পর। আমি ছিলাম স্যারের সামনে। তাই দায়িত্ব বোধে চশমাটি মুছে দিলাম।

আসল কথা হচ্ছে পচা কলা আমার গায়ে না লেগে স্যারের চশমায় লেগেছিল।

যশোর থেকে

আলকাতরা

– ধ্রুব কল্লোল

চশমার কথা শুনতেই মনে পড়ে গেল বন্ধু সালমানের কথা। সংক্ষিপ্ত নাম সালু। চশমা ছাড়া সালু চোখে খুব খারাপ দেখে এমন না। আবার ভালোও দেখে না।

একদিন সকালবেলা চায়ের দোকানে উকি দিয়ে দেখি সালু গোমরা মুখে বসে আছে। লক্ষ্য করলাম সালুর চশমার একটি কাচ মাঝ বরাবর ফেটে গেছে। ফাটা চশমা চোখে গোমরা মুখো সালুকে দেখে হাসিই পেল।

পরের দিন হাত থেকে পড়ে ফাটা কাচটা পুরো ভেঙে গেল, ভালো কাচটাও ফেটে গেল।

সালমান যথেষ্ট আলসে। শুধু আলসেমির কারণে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ওই চশমা চোখে দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। রাস্তার অনেক লোককে দেখেছি তার দিকে অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে। অনেকে হয়তো পাগলও ভেবেছে! অস্বাভাবিক তো কিছু না। বাধ্য হয়ে মাসুদভাই চশমা ঠিক করে দিয়েছিলেন।

চশমা নিয়ে নিজের কোনো স্মৃতি নেই। থাকলেও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ায় ধার করা একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

যাযাদি যখন পড়ছিলাম তখন পাশে ছোট চাচা বসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম চশমা সংক্রান্ত কোনো স্মরণীয় ঘটনা কি আপনার ঘটেছে? চাচা আমার দিকে না তাকিয়ে অনেকটা রোবোটিক ভঙ্গিতে বললো, অনেক দিন আগে একটা চশমা কিনেছিলাম। কেনার পরের দিন সেটা অফিসে হারিয়ে ফেলেছি।

বিরক্তি চেপে বললাম, এই, আর কিছুই নেই?

এবার আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাকালেন। অর্থাৎ আছে।

নিরুৎসাহিতভাবে বললাম, থাকলে বলে ফেলেন।

আমি তখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় এসেছি। বড় শখ কলেজে ভর্তি হবো। একদিন তার থেকেও বেশি শখ করে একটি সানগ্লাস কিনলাম। গ্লাস চোখে দিয়ে বিকেলবেলা বেশ ভাবের সঙ্গে হাটতে লাগলাম। মোড়ের কিছু ছেলে আমায় ডাক দিল।

কাছে যেতেই বললো, তুই তো আলকাতরার মতোই। তার ওপর এই সন্ধ্যার দিকে কালো গ্লাস পরে যে হাটছিস। একবার আয়নায় দেখেছিস। তোকে কালো ভূত ভেবে লোকজন ভয় পেতে পারে। সানগ্লাসটা খুলে পকেটে রাখ। তারপর সোজা হাট। যদি তোকে সানগ্লাস পরা দেখি তাহলে সোজা চোখের ভেতর ঢুকিয়ে দেবো। *যে–ই না চেহারা নাম রাখছে পেয়ারা।*

আমি বুঝতে পারলাম তারা ভালো ছেলে না।

চাচার কথা শেষ হতেই চাচার দিকে এক নজর তাকিয়ে দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। কিছুটা কল্পনা করতে পেরেই আমার হাসি পেল। ওই ছেলেগুলো কেমন ছিল তা জানি না। তবে তাদের কথা যে নেহায়েত মিথ্যা না তা বেশ বুঝতে পারলাম।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

ক্যারিসমা

– এম. মোছাদ্দিকুর রহমান

প্রথম দেখাতেই কারেন্ট শক খেয়ে সুইটির প্রতি কিছুটা দুর্বল হলাম। কিন্তু সেই দুর্বলতা যে আমার কখনো বাস্তবতায় রূপ নেবে ভাবতে পারিনি। সাহসের অভাবে এক দিন, দুই দিন করে অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারিনি। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্য যে সাহসের প্রয়োজন সেটা কখনো আয়ত্ত করতে পারিনি।

একদিন আর্টস বিল্ডিংয়ের বারান্দায় নিউ ফ্যাশনের রঙিন চশমা চোখে দিয়ে দাড়িয়ে আছি। এমন সময় দেখি সুইটি আমার পাশে কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছে। সুযোগ বুঝে মনে সাহস নিয়ে তাকে কয়েকবার চোখ মারলাম।

সে তা বুঝতে পেরে একটু পরে আমার কাছে এলো। তারপর আমার কাছে সে জানতে চাইলো এতো লোকের ভীড়ে তাকে চোখ মারার রহস্য কি?

তখন একেবারে হতবাক হয়ে গেছি। চশমা পরে মনে যেটুকু সাহস সঞ্চয় করেছি তা মুহূর্তেই ফুরিয়ে গেল। কি বলবো? তা চিন্তা করার আগেই সে বলে ফেললো, প্রেম করার যখন এতোই শখ তো দূরে থেকে কেন, কাছে এসে বলতে পারো না? হাবাগোবার মতো যেখানে–সেখানে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে এভাবে চোখ মারলে কি ভালোবাসা হয়? এ জন্যই তো মেয়েরা তোমার মতো ভ্যাবাচ্যাকা ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করতে চায় না বুঝলে? আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইলে এভাবে নয়, সরাসরি প্রস্তাবের মাধ্যমে জানাতে হবে। তারপর হয়তো আমি বিচার–বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। ওকে?

সে হাই হিলে টকটক শব্দ তুলে হলের দিকে রওনা হলো।

রেলিংয়ের ধারে দাড়িয়ে তার চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখলাম। পিঠে তার ঘন কালো চুল এলিয়ে পড়েছে। সুগঠিত শ্রোণিদেশ ওঠানামা করছে।

এরপর আমি তার কথা মতো সরাসরি ভালোবাসার প্রস্তাব দিলাম।

সে অট্টহাস্যে আমাকে *পাগল* বলে সম্বোধন করলো। আমি যে তার প্রেমে সত্যিকার অর্থে পাগল হয়েছি তা বুঝতে পেরে সে আমাকে আর ফিরিয়ে দেয়নি। তখন থেকে আমার চশমার ক্যারিসমায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবাসার গল্প শোনালাম। সে এক দুরন্ত প্রেমের রোমান্টিক গল্প।

রাজশাহী ইউনির্ভাসিটি থেকে

রাতের আলো

– জান মোহাম্মদ

সেদিন গান শুনছিলাম, *তুমি কি কেবলই ছবি...*। আমার এসাইনমেন্ট শেষ। আগামীকাল নাইরোবি ফিরে যাবো। তাই রিলাক্সড মুডে গান শুনছিলাম। তখন তার আগমন। তার সানগ্লাসটা ছিল মেরুন রঙের। মঙ্গল চেহারা, ছোটখাটো গড়ন, চর্বির মতো শাদা চামড়া।

তিনি রুমে নক করলেন।

মোম্বাসা কেনিয়ার প্রধান আতরাপো ও বন্দর। মোম্বাসায় আজ আমার শেষ দিন। আমার অবেচেতন মন সতর্ক হয়ে উঠলো। তবুও দরজা খুললাম।

আমি তানিয়া আহমেদ, এফএও (FAO) কর্মী, এ রেস্ট হাউসে আপনার প্রতিবেশী। বাংলা গান শুনে এদিকে আসা। তিনি বললেন।

তাকে উইশ করলাম। এবং আমার পরিচয় দিলাম।

জানলাম তিনি নাইরোবি থাকেন। তবে কয়েকদিন মোম্বাসায় থাকবেন। এ বন্দরে জাহাজ ভেড়ে না। জাহাজ ভেড়ে কালিন্দিনি হারবারে। পরে ফিডার ভেসেলে করে মালামাল মোম্বাসা বন্দরে আসে। এফএও–র খাদ্য চালানে কি যেন সমস্যা হয়েছে। তাই তার আসা। আমার খুব পছন্দ হলো তার সারল্য, চেহারা এবং মেরুন চশমা।

টানজানিয়া, ইউগান্ডা আর কেনিয়া–তে নব্বইয়ের দশকে কিছু দিন একত্রে কাজ করেছিলাম তার সঙ্গে। আমরা নাইরোবি বেইসড ছিলাম। আমি একটা ডাচ কম্পানিতে কাজ করতাম। নতুন চাকরি। কাজে সিরিয়াস থাকতাম। তিনি ক্রিকেটভক্ত ছিলেন। আমরা উইকএন্ড–এ মিলিত হতাম জিমখানা ক্লাব মাঠে। তিনি মেরুন চশমাটি পরে থাকতেন। তার সঙ্গে কৃকেটের বাইরেও অনেক কথা হতো। কথা হতো শিল্প, সাহিত্য, অ্যানথ্রপলজি আর নেচার নিয়ে।

বেশির ভাগ সময় তার চশমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেখানে আমাকে দেখা যেতো। তিনি খুব নেচার লাভার ছিলেন। আমি জীবনানন্দ দাশ আর হেলাল হাফিজের কবিতা থেকে তাকে শুনতাম।

তিনি বলতেন আমি বিরহী ও ভণ্ড বিপ্লবী।

তাকে শোনাতাম দু প্রিয় মানুষ চেগুয়েভারা ও বাহাদুর শাহ জাফরের কথা।

একদিন তিনি আমায় বললেন, আপনি শুধু আমার নাকের দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন? আমার নাক কি খুব সুন্দর!

তাকে বললাম, আপনার নাকের মতোই আপনি ঋজু এবং সরল।

শুধুই সরল? তার জিজ্ঞাসা।

না, সরল এবং সুন্দর। আমার জবাব।

তিনি বললেন, সুন্দর দেখতে সুন্দর পরিবেশ লাগে।

সুন্দর পরিবেশের খোজে একদিন হাজির হলাম নাইরোবি থেকে আড়াইশ কিলোমিটার দূরের Tsavo National পার্কে। এখানে রয়েছে নানান জাতের গাছ, পাখ–পাখালি ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। প্রচুর ছায়া আর অফুরন্ত শান্তি। এখানে আসছে, যাচ্ছে প্রচুর ভ্রমণকারী।

আমি তাকে শোনালাম –

চারহ গর ভর নহ সকে মেরে জিগরকে নাসুর,

ইক অসর বনদ কিয়া দুসরা রওজন নিকলা।

তিনি বললেন, এখানেও দুঃখের বৃত্ত থেকে বের হতে পারছো না? এ বলে আমার উরুতে মাথা রেখে অবজারবেটরির বেঞ্চিতে তিনি শুয়ে পড়লেন।

আমি প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে তাকলাম।

সে বললো, কি দেখো?

বললাম, নিজেকে দেখি অপরের আয়নায়।

আর কিছু দেখো না?

হু।

কি?

সুন্দর।

কি সুন্দর?

প্রকৃতি।

আর?

তুমি।

সে বললো, রাতের নীলিমা দেখবে?

বললাম, হ্যা দেখবো। রাতের আলো।

সে ন্যাশনাল পার্কে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করেই এসেছিল। রেজওয়ানা বন্যার গান ছিল তার কাছে। রাতের আধারিতে কাঠের ক্যাবিনে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলাম। আবিষ্কার করলাম নিজেদের। আমি তাকে সেগেই–র ইনটেলেকচুয়াল মন্তাজের আদলে সুন্দরের ব্যাখ্যা করলাম। সুন্দর একটি সামগ্রিকতা। এই সামগ্রিকতারও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট আছে।

মানুষের কাজ, ভাবনা, আচরণ, শরীর, মনন ক্রমাগত এবং গভীরভাবে একটি বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে। এ আকর্ষণ যখন ছেদহীন এবং অবিরত হয়ে প্রতিটি বৈশিষ্ট (শরীর, আচরণ, মনন) আবর্তিত হয় তখন সুন্দরের মন্তাজ রচিত হয়। কবিরাও কখনো সুন্দরের প্রতীক।

সেও কবি হয়ে উঠলো। জাফরের আশ্রয়ে তার মনের কথাই বললো।

পাইনি কাউকে বন্ধু ভবে
পরিচিতও নয় সবে
বন্ধু ভেবেছি যাকে যবে
দুশমন সে হয়েছে তবে।

সে আমাকে বন্ধুত্বে আমন্ত্রণ জানালো। প্রচুর আবেগ এবং উষ্ণতা রয়েছে এ আহ্বানে।

আমি কবুল করলাম। আমার বন্ধুত্বে যোগ হলো একমাত্র নারী। তাকে নারী হিসেবে ভাবতাম। মানুষ হিসেবে ভাবতাম। সেও আমাকে। তাই দীর্ঘ দুই বছরেও তার হেরফের হয়নি।

গভীর মমতায় আমরা পরস্পরের সমস্যা এবং অনুভবকে শেয়ার করেছি। আমাদের মাঝে পুরুষত্ব এবং নারীত্বের অনুভূতি প্রথম যোগ হয় ইউগান্ডা–ভিক্টোরিয়া লেকের সি সি দ্বীপপুঞ্জে।

লাস্ট কৃসমাসে (তার সঙ্গে আমার শেষ কৃসমাস) কিলিমানজারো বেসিনে টুর ঠিক করলাম আমরা। সাগরপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার সাতশ বিশ ফিট উচুতে সাড়ে তিনশ গুণ আড়াইশ কিলোমিটার আয়তনের বিশাল লেক ভিক্টোরিয়া। এন্টেবি (Entebbe) থেকে আনুমানিক তিশ কিলোমিটার দূরে এ লেকের মধ্যে ক্ষুদ্র সি সি দ্বীপ। ছোট ছোট কটেজ আছে এখানে। এখানে লেকে ঘোরার জন্য রাবার বোট পাওয়া যায়।

সে বিকিনি পরে সারা দিন ভেসে বেড়ালো। চোখে পরিচিত সানগ্লাস।

আমি এবার সানগ্লাসে শুধু নিজের তসবিরই দেখলাম না। দাড় বাইতে বাইতে দেখলাম আমার বন্ধুর অনাবৃত বক্ষশৃঙ্গ যেন কিলিমানজারোর শুভ্র বরফশৃঙ্গ। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, এগারো হাজার তিনশ বিয়াল্লিশ ফিট উচু কিলিমানজারোর শুভ্র বরফশৃঙ্গ। আমাদের প্ল্যান ছিল এ শৃঙ্গ দেখতে টানজানিয়া যাওয়ার।

তাকে আবৃত হতে বললাম।

সে বললো, তুমি কিলিমানজারো দেখতে চেয়েছিলে! এখন অস্বস্তি কেন?
প্রকৃতির কিলো–শৃঙ্খ দেখার কথা বললাম।
সে বললো, জানো, এ শৃঙ্গ শুধু তোমার, শুধু তোমার।
তার আবেগ আমাকে আকর্ষণ করলো।
তারপরও আমরা তানজানিয়া গিয়েছিলাম। গিতা (বিহারমুলু শহরের কাছে) এবং লুপায়া (Mbeya শহরে) স্বর্ণ খনি দুটো দেখতে গিয়েছিলাম। ভিক্টোরিয়া হ্রদে আরো একটি দ্বীপ আছে উকেরিয়ো, সেখানেও আমরা গেলাম।
মানায়া লেকের ধারে লোভাতুর হয়ে পড়লাম। স্বর্ণ শিখরের অধিকার চাইলাম।
তোমার রক্ষাবরণ উন্মোচনের অধিকার দাও আমাকে
তোমাকে জানাতে দাও তার পরিচয়
তোমার
আত্মপরিচয়ের লিপিকা
আমার হাতে
তুমি তা
গ্রহণ করো
তোমার
বন্দনার ভাষা আমি জানি
নতজানু হয়ে
সে ভাষা উচ্চারণের অধিকার আমায় দাও।
সে আমাকে অনেক আগেই সব অধিকার দিয়ে রেখেছিল। বলেছিল, তার সব কিছু আমার।
মন্তাজ অফ এট্রাকশন এবং মন্তাজ অফ বিউটিতে বিশ্বাস করতাম। তার প্রতি আমার আকর্ষণের মন্তাজ ছিল। আর মন্তাজ অফ বিউটির পূর্ণতা পেল আরুশায়। গ্রাম্য সরদার সিদ আবাসার ঘরে ফারের কম্বলের আশ্রয়ে, শীতের রাতে। এখানের কফি, কেসাউ বাদাম, ইক্ষু এবং আরুসা চিনির মতোই তৃপ্তিকর ও সুখদ ছিল এ মন্তাজপূর্তি।
আজ দীর্ঘ বারো বছরে সময় অনেক এগিয়েছে। হারিয়েছি সময়, হারিয়েছি অপেক্ষার অধিকার। এখনো দেখি মন্তাজ অফ বিউটি। রাতের আলোয়। রাতের নীলিমায়।
তবু অপেক্ষায় আছি তার সানগ্লাসের প্রতিবিম্ব দেখার আবার কোনো সময়ে।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

পড়ন্ত বেলায়

– মোহাম্মদ জহুরুল হক মানিক

যায় যায় করে দিন চলে যাচ্ছিল। দোতলার ঝুল বারান্দায় বসে প্রকৃতির খেলা দেখছিলাম। শ্রাবণ মাস, অথচ খা খা রোদ্দুর। ঠিক যেন বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ, সব সময় উল্টো নীতি। এখন অঝর ধারায় বৃষ্টি হওয়ার কথা। তা না, হচ্ছে যেন রোদ–বৃষ্টি! চারদিক জ্বলে যাক, পুড়ে যাক, কিংবা ডুবে যাক তাতে আমার কি, এমন অবস্থা।

বার্ধক্যে ধরা এ চোখে মোটা কাচের চশমা পরে তাকিয়ে আছি যেন পানির মধ্য দিয়ে দেখছি। এমন সময় একমাত্র ছোট্ট দাদাভাই হই চই করতে করতে ছুটে এলো। হাতে তার যায়যায়দিন পত্রিকা। বললো, দাদু, এটা তোমার জন্য বাবা দিয়েছেন।

আজকের দিনটিতে অন্তত আমি এ পত্রিকাটি পড়তে চাচ্ছি না। কারণ এ পত্রিকাটির খুব ঝাল। পড়লে অন্তত এক জগ পানি খেতে হবে। এখন পানি খেতে ইচ্ছা করছে না।

এরই মাঝে অরণ্য বক বক শুরু করেছে। অরন্য আমার দাদাভাইয়ের নাম। আমার নাম জহুরুল হক। শুরু জ দিয়ে কিন্তু তার নাম অ দিয়ে। আগে বংশের মানুষের নাম দিয়ে বোঝা যেতো কার ছেলে বা নাতিকে। এখন দাদার নাম যদি চৌধুরী ইফতেখার হয়, তার নাতির নাম হবে রিফাত, শিফাত, ইমরুল, ভীমরুল। বোঝার উপায় নেই এটা মানুষের নাম, না অন্য কিছুর।

যাক এসব কথা। অরণ্য বায়না ধরেছে গল্প শোনাতে হবে।

কি গল্প বলবো। এক সময় খুব গল্প বলতাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের বাস্তব কথা বলতাম। এখন আর ভালো লাগে না। স্বাধীনতার যেন গলা টিপে ধরে আছি। গল্প বলা এবং শোনা আর ভালো লাগে না। তবে জীবনে দুটি ঘটনা আছে যা খুব বলতে ইচ্ছা করে। আজ অরণ্যকে শোনাবো সে গল্প। হ্যা গল্পই তো।

তখন আমি ছোট। এই সেভেন কিংবা এইটে পড়ি। থাকতাম দিনাজপুর জেলায় পার্বতীপুর শহরে। পার্বতীপুর ছোট মফস্বল শহর। এখানকার মানুষগুলো খুব ভালো। ঝগড়াঝাটি, মারামারি নেই। সকলেই মিলে মিশে থাকে। একে অপরের খোজ নেয়। আমাদের পরিবারে দারিদ্র ছিল না। আমার চার চাচাসহ বাবা একই বড় একটা বাড়িতে থাকতেন। আমার বাবা তেমন শিক্ষিত না। কিন্তু মা শিক্ষিত ছিলেন। তাই আমাদের এই লেখাপড়া শেখা।

আমাদের পরিবারের সবাই হিসাব করে চলতেন। বাড়তি কোনো খরচ চলবে না। বাড়তি খাওয়া–দাওয়া, জামা–কাপড় ছিল না। তবু আমি সুখী ছিলাম। অনিয়মিত স্কুলে যাওয়া, চুরি করে আম, পেয়ারা খাওয়া, পুকুরে ঝাপিয়ে পড়ে লাফালাফি করা ইত্যাদি। বড়রা তখনকার ঘোলাটে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। ছোটদের প্রতি তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাই সবাই স্বাধীন।

ক্লাস এইটে পড়ার সময় নতুন ভর্তি হওয়া এক ছাত্রী, নাম রেহানার সঙ্গে পরিচিত হলাম। সে নতুন এসেছে। বাবা চাকরি করে।

রেহানা একদিন আমাদের কয়েক বন্ধুকে তাদের বাসায় যেতে বলে।

এক সোনালি বিকেলে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে রেহানাদের বাড়িতে গেলাম। সবাই ভালো কাপড় পরেছি। শুধু ব্যতিক্রম আমার চোখে একটি চশমা। তাও আবার আমার পাশের বাড়ির বন্ধুর কাছ থেকে ধারে নেয়া। কারণ চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। দেখলে মনে হবে যেন চোখ উঠেছে।

রেহানাদের বাড়িতে যেতেই রেহানা সবাইকে নিয়ে ভেতরে বসার ঘরে বসালো।

আমরা সবাই গুটিসুটি হয়ে বসে আছি। নতুন বাড়ি। তাই কেউ তেমন কথা বলছিলাম না। এমন সময় রেহানার ছোট ভাই বাপ্পী এসে হাজির। এসে চুপচাপ অদ্ভুত আগন্তুককে দেখতে লাগলো। তারপর দৌড়ে তার মায়ের কাছে গিয়ে বললো, চশমা নেবো। অর্থাৎ বাপ্পী অন্য চশমা নেবে না, আমারটাই তার চাই। গো ধরে আছে।

ভদ্রতা রক্ষার জন্য আমার চশমাটা খুলে দিলাম যাওয়ার সময় নিয়ে নেবো এই ভেবে। তারপর কথাবার্তা বলে, চা–নাশতা খেয়ে চলে আসার সময় বললাম চশমাটা দিতে।

কিন্তু বাপ্পী যেন কথাটা বুঝতেই পারলো না। যেন চশমাটা তার হারানো ধন, কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। প্রয়োজনে মার খাবে, হরতাল করবে। তবুও চশমা দেবে না। দেখতে দেখতে বাড়ির কর্তৃপক্ষের এক চোট ধুমধাম খেল।

অগত্যা রেহানার আম্মুকে বললাম, খালাম্মা, আমি পরে এসে চশমা নিয়ে যাবো।

বাড়ি থেকে বের হয়ে এলাম। মুখ দেখলেই বোঝা যেতো যেন মনের আস্তানা কেউ বোমা হামলায় উড়িয়ে দিয়েছে।

পরের দিন গেলাম রেহানাদের বাড়ি। উদ্দেশ্য চশমা আনা। কিন্তু যাওয়াটাই সার।

যেতেই খালাম্মা বললেন যে, বাপ্পি চশমাটা ভেঙে ফেলেছে। কাচ ভাঙেনি। ফ্রেমটাই ভেঙেছে।

বললাম, ছোট মানুষ, ভেঙেছে তো কি হয়েছে!

যেন এটা কোনো ব্যাপার নয়। ভেবেছিলাম যে হয়তো চশমা কিনে দেবে। তাই অনেক কয়েকদিন গেলাম ওই বাড়িতে। কিন্তু না। স্বপ্ন হলো দুঃস্বপ্ন।

অস্থির হয়ে পড়লাম। বন্ধুর চশমা ফেরত তো দিতে হবে। কিন্তু চশমা পাবো কোথায়? শেষে খবু কষ্ট করে এদিক–ওদিক করে একশ টাকা নিয়ে কাছের বাজারে গেলাম চশমা নেবো ভেবে। অনেক চশমা দেখলাম। কিন্তু ওই চশমার মতো একটিও পেলাম না।

শেষে একটা পছন্দ করে দাম জিজ্ঞাসা করলেই চাইলো দুইশ দশ টাকা।

একেবারে আতকে উঠলাম। দুইশ দশ। খাইছে আমারে!

পরাজিত সৈনিকের মতো বাড়ি ফিরে এলাম। এসেই দেখি আমার সেই বন্ধু। আমার মুখ একেবারে পাংসু হয়ে গেল। মাথা ভন ভন করে ঘুরতে লাগলো।

বন্ধুটি বললো, কিরে মানিক, তোর পাত্তাই নেই। একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছিস। ব্যাপার কি!

আমতা আমতা করে বললাম ঘটনাটি।

সে হো হো করে হেসে উড়িয়ে দিল আমার মুখের জমানো মেঘ। বললো, সামান্য চশমাই তো, আর কি! আরো বললো, এই জন্য তোকে বলি মোহাম্মদ জহুর আলী, অংকে প্রাইমারি। আসলে বন্ধুত্বই হলো আসল। অন্য কিছু সব নশ্বর।

তারপর বাংলার পদ্মা শুকিয়ে গেল। কতো ঝড় এলো গেল। অনেক দিন পর...।

একদা এই ঢাকার রমনার বটমূলে বসে প্রিয়াকে বলেছিলাম এই চশমার ঘটনাটি। তারপর আমার সেই অনামিকা আমাকে সুন্দর একটি চশমা উপহার দিয়েছিল।

সেই আমার অপরাজিতা হারিয়ে গেছে একাত্তরের বৈশাখি অস্ত্র ঝড়ে। কিন্তু তার দেয়া সেই চশমা আমার কাছে আছে। এখনো এই পড়ন্ত বেলাতেও সেই চশমাটি আছে। এ সামান্য স্মৃতিই আজ আমার গল্প। ভেবেছি দুনিয়া ছাড়ার আগে চশমাটি অরণ্যকে মানে দাদুভাইকে দিয়ে যাবো। সেও যেন এই চশমা পরে খুজে দেখবে রমনার বটমূলের সেই সবুজ ঘাস।

পার্বতীপুর, দিনাজপুর থেকে